হুমায়ূন আহমেদ

যশোহা বৃক্ষের দেশে

নেভার নেভার ল্যান্ড

এপ্রিল মাস।

অসহনীয় গরম পড়েছে। এই গরমে শুরু করেছি 'আগুনের পরশমণি' ছবির ইনডোর শুটিং। গুদামের মতো ফ্লোরে সেট সাজানো হয়েছে। হাজার হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। প্রকাণ্ড দুটি ফ্যান অবশ্যি ঘুরছে। ফ্যানে শব্দ যত হচ্ছে বাতাস তত হচ্ছে না। সেই বাতাসেও আগুনের হলকা। গরমকে সহনীয় করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে চোখ বন্ধ করে বরফের দেশের কথা ভাবা—কনকনে শীতে তুন্দ্রা অঞ্চলে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছি—এই সব।

সেটের লাইটিং করা হচ্ছে। লাইটিং শেষ হতে ঘণ্টাখানিক লাগবে। আমার কিছু করার নেই। সেটের বারান্দায় বসে লাইটিংয়ের পদ্ধতি দেখতে দেখতে ভাবছি, আমি আসলে তুন্দ্রা অঞ্চলে। হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে 'ইগলু'র সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবনাটা জমল না। নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হলো। যে জায়গা কখনো দেখি নি সে জায়গা নিয়ে ভাবব কীভাবে? তুন্দ্রা অঞ্চল বাদ থাক, অন্য কোনো শীতের দেশের কথা ভাবি। আচ্ছা, নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহরের কথা ভাবলেই তো হয়। দীর্ঘ দিন ওই অঞ্চলে কাটিয়েছি। কী প্রচণ্ড শীতই না পড়ত। আলাস্কা থেকে উড়ে আসত হিমেল বাতাস, থার্মোমিটারের পারদ নামতে নামতে মাইনাস তিরিশ পর্যন্ত চলে যেত। একবার গাড়ি নিয়ে আটকা পড়লাম তুষারঝড়ে। ঠাণ্ডায় জীবন-সংশয়ের মতো হলো...

নিজের অজান্তেই আমি ফার্গো শহরের কথা ভাবতে শুরু করেছি এবং বাইরের গরম আর অনুভব করছি না—বরং খানিকটা শীত শীতই লাগছে। শুটিং শেষ করে বাসায় ফিরলাম নস্টালজিক হয়ে। কেবলই ফার্গো শহরের কথা মনে পড়তে লাগল। সেই শহরে প্রথম সংসার শুরু করলাম। ইউনিভার্সিটি হাউজিংয়ে থাকার জন্যে দোতলা বাড়ি দিয়েছে। দু'রুমের ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাউজ। কী চমৎকার ছবির মতো বাড়ি! এক সন্ধ্যাবেলায় সে বাড়িতে উঠলাম আমি, গুলতেকিন এবং আমাদের প্রথম কন্যা ছ'মাস বয়সী নোভা। আসবাবপত্র আমাদের কিছু নেই। প্রথম রাতে দুটা কম্বল পেতে বিছানা করলাম। শুরু হলো সংসার। টাকাপয়সার খুব টানাটানি। চার শ' ডলার পাই। সেখান থেকে দেশে মা'কে কিছু পাঠাতে হয়। সারা মাস হাত প্রায় খালিই থাকে। কিছু টাকা জমলেই আমরা দোকানে চলে যাই—সংসারের জন্য জিনিস কেনা হয়। খুব সাহস করে গুলতেকিন একবার কোরেলের একটা সেট কিনে ফেলল—চারটা কাপ, চারটা প্লেট, চারটা পিরিচ। সে কী খুশি! সংসারে নতুন জিনিস এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও খুশি। ঝকঝকে নতুন প্লেটে ভাত খাওয়া হলো। চায়ের কাপে চা খাওয়া হলো। খাবারের শেষে সবকিছু খুব সাবধানে ধুয়ে মুছে রাখা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমেরিকা নিয়ে আমার কত না মধুর স্মৃতি। প্রথম গাড়ি কিনলাম। লক্কড় ধরনের পুরনো গাড়ি। তাতে কী? হর্ন তো বাজে, রাস্তায় চলে।

দ্বিতীয় মেয়ের জন্ম হলো—কত আনন্দময় ঘটনা! তারপর একদিন পিএইচডির ভাইভা শেষ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। উত্তেজনায় কাঁপছি—কী হয় কী হয়! প্রফেসর জেনো উইকস বের হয়ে এসে বললেন, আমি এখন তোমাকে ডক্টর হুমায়ূন সম্বোধন করতে পারি—Congratulations my boy. কত কষ্টের পর এই ডিগ্রি! চোখ ভিজে আসছে—প্রাণপণ চেষ্টা করছি যেন চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে যায়, টপ করে গালে না পড়ে।

রাতে ভাত খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ আমেরিকার গল্প করলাম। গল্প করতে করতে মনে হলো—আরেকবার যদি নর্থ ডাকোটায় যেতে পারতাম। স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো যদি দেখতে পারতাম। রাতের খাবার শেষ করে ঘুমুতে যাওয়ার আগে আগে একটা কাকতালীয় ব্যাপার হলো। নিউ জার্সি থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়কার বন্ধু ড. নবী টেলিফোন করে বলল, হুমায়ূন, তুমি কি আমেরিকা আসতে পারবে? আমাদের নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন হচ্ছে—আমরা তোমাকে গেস্ট অব অনার করতে চাচ্ছি। সেপ্টেম্বরের দুই-তিন সম্মেলনের তারিখ। আসবে?

হ্যাঁ, আসব।

ভাবিকে কি নিয়ে আসবে?

না, ওকে আনতে পারব না। এইসময় তার পরীক্ষা চলবে।

তুমি একাই চলে এসো। আমরা যথাসময়ে চিঠি পাঠাব।

ব্যাপারটি কেমন হলো? যখন খুব তীব্রভাবে নর্থ ডাকোটা যাওয়ার জন্য ভাবছি তখনই নিমন্ত্রণ। এটা টেলিপ্যাথি? টেলিপ্যাথি নামের ব্যাপারটা কি সত্যি আছে? না সম্পূর্ণ কাকতালীয় যোগাযোগকেই অন্যরকম মনে হচ্ছে?

দূরের দেশে ভ্রমণের সব ঠিকাঠাক হলেই আমি হোমসিক বোধ করতে থাকি। হোমসিকের খুব সুন্দর একটা ময়মনসিংহের শব্দ আছে—'পেট পোড়া'। আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারে সব ঠিকঠাক হওয়ার পর আমার পেট পুড়তে শুরু করল। আমি একা একা ঘুরব—আর সবাই পড়ে থাকবে এখানে। বাচ্চাগুলোর কত শখ আমেরিকা দেখার, ডিজনিল্যান্ড দেখার। ওদের শখ মিটিয়ে দিলে কেমন হয়? আমার তিনটা মেয়ে, কোথায় না কোথায় এদের বিয়ে হবে! চলে যাবে দূরে দূরে। স্বামীরা হয়তো এদের নানাভাবে কষ্ট দেবে। বাবা হিসেবে যদি তাদের কিছু গোপন শখ পূর্ণ করে দিয়ে যেতে পারি, মন্দ কী? সমস্যা হলো টাকার। এত টাকা পাব কোথায়? ছবি বানানো নিয়ে দীর্ঘদিন ব্যস্ত আছি। লেখালেখি হচ্ছে না, লেখালেখি থেকে টাকা আসবে না। সঞ্চিত অর্থের সবটাই লেগেছে 'আগুনের পরশমণি' ছবিতে। তাহলে উপায় কী? উপায় একটা হবেই। আমি আরেকবার লক্ষ করেছি—মনস্থির করলে আর কিছু আটকায় না। উদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

একবার ঠিক করে ফেললে সেই উদ্দেশ্য পূরণের ব্যবস্থা হয়েই যায়। বাড়ি বানানোর জন্য ব্যাংক লোন দিয়েছে। লোনের টাকাটা নিয়ে চলে গেলে কেমন হয়? ভালোই হয়।

শুক্রবার দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসি। সেদিন খাবার টেবিলে মেয়েদের বললাম, তোমরা কি আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যাবে?

তিন কন্যা কোরাসের মতো বলল, না।

না কেন?

বড় মেয়ে বলল, তার ইন্টারমিডিয়েট প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। সে ভালোমতো পরীক্ষা দেবে। ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করবে না।

মেজো মেয়ে বলল, আমি জানি তুমি যাবে সেন্টমার্টিন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিন আমি মরলেও যাব না। যে ঢেউ!

সবচেয়ে ছোটটি বলল, তুমি যেখানে যাবে একগাদা লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাও। ওদের সঙ্গে গল্প কর। আমার ভালো লাগে না।

তোমরা তাহলে যেতে চাও না?

না।

কোথায় যাচ্ছি জানলে যেতে চাইতেও পার। জায়গাটার নাম—নেভার নেভার ল্যান্ড।

সেটা আবার কী?

স্বপ্নের একটা দেশ। যে দেশে সহজে যাওয়া যায় না। আমেরিকা। যাবে তোমরা?

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

ছোট মেয়ে খাওয়া রেখে এঁটো হাতে উঠে গেল। মনে হচ্ছে টেলিফোনে সে তার প্রিয় বান্ধবীকে খবর দিতে গেল।

বড় মেয়ে বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মেজোটিও বলল, আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না।

ছোটটি টেলিফোনে তার বান্ধবীকে পেয়েছে। খাবার টেবিলে বসে আমি তার উত্তেজিত কথাবার্তা শুনছি—

হ্যালো মৌরী, আমরা আমেরিকা যাচ্ছি। বলো তো তোমার জন্য কী আনতে হবে?

গুলতেকিন বলল, তুমি চট করে মেয়েদের আমেরিকা যাওয়ার কথা বললে, সব ফাইনাল করে তারপর বলার দরকার ছিল—যদি টাকার জোগাড় না হয়।

টাকার ব্যবস্থা করে ফেলব।

ভিসা সমস্যা হয়তো হতে পারে। পুরো পরিবারকে কি আর একসঙ্গে ভিসা দেবে? ওদের ভিসার যা কড়াকড়ি। ওরা আশা করে থাকল—তারপর দেখা যাবে ভিসা পাওয়া গেল না...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

তাই তো, ভিসার কথা আগে মনে হয় নি—ফ্যাকড়া তো একটা রয়েই গেল।

বাংলাদেশের মানুষ তোমাকে খাতির করে। তারা তোমার নাটক-টাটক দেখেছে, বই পড়েছে। আমেরিকানরা তোমাকে খাতির করবে কেন? তারা তোমার নাটক দেখে নি, বইও পড়ে নি...।

ওরাও খাতির করল। এক মাসের ভিসা চেয়েছিলাম—ওরা সবাইকে এক বছরের ভিসা দিয়ে দিল।

এক সন্ধ্যায় কাঁধে ব্যাগ-প্যাক আর হাতে স্যুটকেস নিয়ে আমরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠলাম। আমার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান নুহাশ খুব কথা শিখেছে। সে প্লেনে ওঠার আগে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎকার শুরু করল—আমি এত বড় প্লেনে উঠব না, ছোট প্লেনে উঠব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

নায়ে-গারা

আমি নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে চাই শুনেই আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল এবং তার স্ত্রী ইয়াসমিন একসঙ্গে হেসে ফেলল। আমি তাদের হাসির কারণ ধরতে পারলাম না। পৃথিবীর সেরা জলপ্রপাতের একটি দেখতে চাওয়ার মধ্য হাস্যকর কী আছে ? আমি বোকার মতো ওদের দিকে তাকাচ্ছি। ইকবাল হাসির কারণ ব্যাখ্যা করল। তার কাছেই জানলাম—বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি এই তিন জনগোষ্ঠীর কেউ আমেরিকা বেড়াতে এলে পকেটে করে কী কী দেখবে তার লিস্ট নিয়ে আসে। লিস্টের শুরুতে থাকে 'নায়েগ্রা ফলস'। এরা নায়েগ্রা ফলস না দেখে দেশে ফেরে না। অন্য কিছু দেখুক না-দেখুক নায়েগ্রা ফলস দেখবেই। ঢাকা শহরে গ্রাম থেকে কেউ বেড়াতে এলে যেমন চিড়িয়াখানা না দেখে ফেরে না, নায়েগ্রা ফলসও এশিয়ানদের চিড়িয়াখানা।

আমি বললাম, এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা ছোটবেলা থেকে ভূগোল বইয়ে এই জলপ্রপাতের নাম পড়েছি। আমেরিকায় নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে—আমাদের ভূগোল বইয়ে তাদের তালিকা নেই। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথাই শুধু আছে। কাজেই এই জলপ্রপাত নিয়ে আমাদের অনেক কল্পনাও আছে। আমেরিকায় আসব—কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব না।

ইকবাল বলল, জলপ্রপাত তোমার না দেখাই ভালো হবে। কল্পনার সঙ্গে মিল খাবে না, মন খারাপ হবে। বর্তমানের নায়েগ্রা জলপ্রপাত হলো পোষা জলপ্রপাত।

পোষা জলপ্রপাত মানে ?

আমেরিকানরা জলপ্রপাতকে পোষ মানিয়ে ফেলেছে। একেবারে পুরোপুরি গৃহপালিত পশু। পাওয়ার জেনারেটর বসিয়েছে। মাঝে মাঝে এরা জলপ্রপাতের পানি পুরোটা বন্ধ করে দেয়। পানি বন্ধ করে পাওয়ারপ্ল্যান্টের যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে। আবার পানি ছাড়ে। প্রাকৃতিক মহা বিস্ময়ের বিস্ময় এখন আর নেই।

তারপরেও আমি ঠিক করলাম, জলপ্রপাত দেখে যাই। আমাদের হিমছড়িতে একটা জলপ্রপাত আছে। ট্যাপের পানি যেমন পড়ে সেরকম ক্ষীণ জলধারা। অনেক ঝামেলা করে সেই জলপ্রপাত দেখতে গিয়েছি। সেই টিপ টিপ করে পানি পড়া দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সিলেটের মাধবকুণ্ডের জলপ্রপাত দেখতেও কম ঝামেলা হয় নি। সেই জলপ্রপাত দেখেও মুগ্ধ হয়েছি। নায়েগ্রা বাদ থাকবে কেন ?

আমার ব্যাটেলিয়ান পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রী সব মিলিয়ে ছজন রওনা হলাম ট্রেনে করে। ভোর সাড়ে আটটায় রওনা হয়ে রাত সাড়ে আটটায় পৌঁছানো—বার ঘণ্টার যাত্রা। এর আগেও একবার এমট্রাকে করে দীর্ঘ ভ্রমণ করেছি। আইওয়া থেকে সানফ্রান্সিসকো প্রায় দুদিন দু'রাত। সে যাত্রায় আমার সঙ্গী ছিল গুলতেকিন। ভ্রমণ ছিল অসাধারণ। দোতলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ট্রেন। একতলায় মালপত্র, বাথরুম, রেস্টুরেন্ট। দোতলায় যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা। অবজারভেশন ডেক নামে একটা কামরা আছে যার পুরোটাই কাচের তৈরি। এখানে বসে চারদিক দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। আমার দেখা জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য এই কামরায় বসেই দেখেছি। ট্রেন গিয়েছিল রকি মাউনটেইনের ভেতর দিয়ে। আহা কী দৃশ্য!

যাই হোক, নায়েগ্রাগামী এমট্রাকে চড়ে দারুণ হতাশ হলাম। কোনো অবজারভেশন ডেক নেই। ট্রেন চলছেও ধীরে ধীরে। আমার বড় মেয়ে বলল, বাবা, এরচেয়ে আমাদের বাংলাদেশের ট্রেনগুলো তো অনেক ভালো। জানালা খোলা যাচ্ছে না। জানালা দিয়ে মুখ না বের করলে ট্রেনে চড়ায় মজা কী?

আমারও কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে। দমবন্ধ কত প্রকার ও কী কী তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম আমি, যখন ট্রেনের ইন্টারকমে জানানো হলো—'এই ট্রেন পুরোটাই ধূমমুক্ত। কাজেই যাত্রীদের কেউ ধূমপান করতে পারবে না।' আমার পকেটে ভ্রমণের সময় আরাম করে টানার জন্য দু'প্যাকেট ডানহিল সিগারেট। ট্রেনে উঠে ধরাব বলে প্যাকেট এখনো খোলা হয় নি। এক-দু'ঘণ্টা হলে একটা কথা ছিল। পুরো বার ঘণ্টা সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে বসে থাকব, খেতে পারব না—তা কী করে হয়? সিগারেট যারা খায় তারা তো কোনো অপরাধী না। কেন তাদের বেলাতেই এই শাস্তি? সিগারেট খাওয়া যাবে না, অথচ সমানে মদ বিক্রি হচ্ছে। এক একজন ট্রে ভর্তি করে নিয়ে আসছে। আমার সামনের সিটের দুই আমেরিকান দুপুর পর্যন্ত মদ্যপান করে হেড়ে গলায় গান ধরল—

'লা, লা, ট্রা লা লা...'

মদ খেয়ে মাতাল হয়ে একটা কাণ্ড ঘটানোর নজির আছে। সিগারেট খেয়ে কেউ কোনোদিন ভয়ংকর কিছু করেছে এমন নজির নেই। আমি দরবার করার জন্য গেলাম ট্রেনের কন্ডাকটরের কাছে। সে আমার যুক্তি মন দিয়ে শুনল। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, ট্রেন যখন কোনো স্টেশনে থামে তখন কি আমি নিচে নেমে সিগারেট খেতে পারি?

সে বলল, কোনো কোনো ট্রেনে এই ব্যবস্থা আছে, তবে এই ট্রেনে তাও নেই।

বলো কী!

তবে তোমার যদি প্রথম শ্রেণীর টিকিট থাকত তাহলে তুমি সিগারেট খেতে পারতে। প্রথম শ্রেণীর স্লিপিং কোচে সিগারেট খাওয়া যায়।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ যাদের ডলার আছে তারা নিষিদ্ধ কাজও করতে পারে?

কন্ডাকটর হেসে দিয়ে বলল, অবশ্যই পারে—এ তো অতি পুরাতন কথা। তুমি অস্থির হয়ো না। রাত আটটা কুড়ি মিনিটে ট্রেন নায়েগ্রা পৌঁছবে। তুমি আটটা একুশ মিনিটে সিগারেট ধরাতে পারবে।

ততক্ষণ আমি বেঁচে থাকব না। তার আগেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাব।

সিগারেটের অভাবে এখন পর্যন্ত কেউ মারা গিয়েছে বলে শোনা যায় নি। তুমিও মারা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মারা গেলাম না ঠিকই, তবে অর্ধমৃত অবস্থায় নায়েগ্রা পৌঁছালাম। আমেরিকার ট্রেন লেট করে না যারা বলে তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, আটটা কুড়িতে পৌঁছানোর কথা, আমরা পৌঁছালাম রাত দশটায়। স্টেশন থেকে হোটেলে যাব। ক্যাব ভাড়া করতে হবে। অনেক ক্যাব আছে, কেউ আমাদের নেবে না। কারণ আমরা হচ্ছি ছজন। পাঁচজনের বেশি ক্যাবে তোলার নিয়ম নেই। পুলিশ টিকিট দিয়ে দেবে। এত রাতে দুই ক্যাবে ভাগাভাগি করে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল যে কিছু বেশি ডলারের বিনিময়ে এই বেআইনি কাজটি করতে রাজি আছে। শর্ত একটাই—একজনকে মাথা নিচু করে বসতে হবে যাতে পুলিশ দেখতে না পায়। আমি নিজেই মাথা নিচু করে বসতে রাজি হলাম। এসব ভেবেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ মাথা নিচু করার প্রার্থনা জানিয়ে কবিতা লিখেছেন।

হোটেলে পৌঁছেও আরেক বিপদ। আমরা একই পরিবারভুক্ত হলেও আমাদেরকে ফ্যামিলি রুম দেওয়া যাবে না। আমেরিকার আইন পাঁচ সদস্য পর্যন্ত পরিবার স্বীকার করে। ছয় সদস্যের পরিবারকে দুটো রুম নিতে হবে। নিলাম দু'টা ঘর। দুই রাত থাকতে হবে—গুনে গুনে চার শ' ডলার দিতে হলো। নিউজার্সি থেকে ট্রেন ভাড়া, হোটেল ভাড়া সব হিসাব করে দেখি, পনের শ' ডলারের চক্করে পড়ে গেছি। বাংলাদেশি টাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এত টাকা খরচ করে শেষটায় কী দেখব? পোষা জলপ্রপাত?

সাদা চামড়ার প্রথম যে মানুষটি নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখেন তাঁর নাম জন লুইস হেনিপ্যান। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। রেড ইন্ডিয়ানদের কাছে যিশুর বাণী পৌঁছানোর জন্য যিনি নিজের জীবন নিবেদন করেছিলেন। ১৬৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সকালে তিনি এই জলপ্রপাতের সামনে এসে উপস্থিত হন। বিস্ময়ে তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনায় বসেন। প্রার্থনা শেষে উচ্চস্বরে বলেন—'প্রকৃতির এ মহা জলরাশির তুল্য কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও নেই। থাকতে পারে না।'

ফাদার জন লুইস হেনিপ্যানের বিস্ময় তিন শ' ষোল বছর পরে কতটুকু অবশিষ্ট আছে তা দেখার জন্য ভোরবেলা রওনা হলাম। গাইডেড ট্যুর। আমেরিকান গাইড রোবটের মতো কথা বলে যাচ্ছে। কেউ শুনছে কি শুনছে না তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। একগাদা তথ্য। একের পর এক দিয়ে যাওয়া। পানি পড়ছে ১৬৭ ফুট উপর থেকে। প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন গ্যালন। নায়েগ্রা নামটি এসেছে নায়া-গারা থেকে। নায়া-গারার অর্থ হলো দেবতার গর্জন।... ব্যাটা ঘ্যানঘ্যান করেই যাচ্ছে। তেরজন সদস্যের সে হচ্ছে গাইড। আমরা তেরজনই মহা বিরক্ত। আমাদের দলে আছেন রিপাবলিক অব কোরিয়ার এক রিটায়ার্ড জেনারেল। নাকচ্যাপ্টা মানুষেরা সাধারণত সহনশীল হয়। একপর্যায়ে তিনিও নাকচ্যাপ্টা হওয়া সত্ত্বেও মহা বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, গাইডের কথা তো কেউ শুনছে না—তারপরও সে বকবক করছে কেন?

গাইড বকবকানির চেয়েও খারাপ কাজ যা করছে তা হচ্ছে—আমাদের সব আজেবাজে জায়গায় ঘুরাচ্ছে। মূল জলপ্রপাতের কাছে নিচ্ছে না। প্রথম নিয়ে গেল হাইড্রলিক পাওয়ারপ্ল্যান্টে। মোসেস নামের এক ইঞ্জিনিয়ারের নামে পাওয়ারপ্ল্যান্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

নাম। পাওয়ারপ্ল্যান্টের খুঁটিনাটি বিষয়ে সে দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করল। এক একটা টারবাইনের ওজন কত, কীভাবে তা বসানো হলো, বসাতে গিয়ে কতজন মারা গেল। বিতং বর্ণনা। আমরা এসেছি জলপ্রপাত দেখতে, পাওয়ারপ্ল্যান্টের টারবাইন কীভাবে কাজ করে সেটা জেনে কী হবে।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা পাওয়ারপ্ল্যান্টের বক্তৃতা শোনার পর সে আমাদের এক স্যুভেনিয়ারের দোকানে নিয়ে উপস্থিত করল। হাসিমখে বলল, স্যুভেনিয়ার নাও। খালি হাতে ফিরলে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাবে কী?

আমরা স্যুভেনিয়ার কিনলাম। আকাশছোঁয়া দামে আজেবাজে জিনিস। দেশে ফিরে প্রথমই হবে এইগুলো ফেলে দেওয়া।

স্যুভেনিয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর সে আমাদের নিয়ে গেল নায়েগ্রা নদীর এক জায়গায়, যেখানে ঘূর্ণি হয় তা দেখাতে। আরে ব্যাটা, নদীর ঘুর্ণি দেখার জন্য তো এখানে আসি নি। এ তো দেখি মহা বিপদে পড়া গেল। সে এইখানে তার দীর্ঘতম বক্তৃতা শুরু করল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু—ঘূর্ণিটা কেন হচ্ছে। তার বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে সে নদী বিশেষজ্ঞ একজন। পিএইচডি প্রোগ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে ব্যাটাকে ধাক্কা দিয়ে ঘূর্ণিতে ফেলে দিতে।

নয়টার সময় গাইডের সঙ্গে বের হয়েছি, এখন বাজে বারটা। সাড়ে তিন ঘণ্টার ট্যুরে তিন ঘণ্টা চলে গেছে, বাকি আছে আধ ঘণ্টা। এখনো মূল জলপ্রপাত দেখি নি। এর মানে কী? আমার ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল—হয়তো জলপ্রপাতই নেই। আজ বোধহয় পানি বন্ধ করে দিয়েছে। পানি থাকলে এর মধ্যে সে নিশ্চয়ই দেখাত।

বারটা দশ মিনিটে গাইড আমাদের নিয়ে গেল ছাগল দ্বীপে (গোট আইল্যান্ড)। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। এই প্রথম সে কোনো বক্তৃতা করল না। আমাদের মতোই মুখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল জলপ্রপাতের দিকে।

দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকার পর আমার মনে হলো—আমি এটা কী দেখছি? যে বিস্ময় তিন শ' বছর আগে ফাদার হেনিপ্যানকে অভিভূত করেছিল, সেই বিস্ময় আমাকেও গ্রাস করল। আমার মনে হলো, প্রকৃতি নিজেকেই তার সৃষ্টিতে নানান ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেন। এখানে তিনি ভয়ংকর সুন্দররূপে নিজেকে প্রকাশ করছেন। যে মানুষ এই ভয়াবহ জলরাশিকে পোষ মানিয়েছে—প্রকৃতি নিজেকে তাদের ভেতরও প্রকাশ করেছেন। সেই মানুষও নমস্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আকাশ-চিঠি

বাচ্চারা আজ 'লায়ন কিং' দেখে এল। ওয়াল্ট ডিজনি প্রডাকশনের ছবি। আমেরিকায় সুপারহিট করেছে। আমেরিকার 'বেদের মেয়ে জোছনা'। আমেরিকা এখন লায়ন কিংময়। লায়ন কিং টি-শার্ট, লায়ন কিং খেলনা, লায়ন কিং জুতা, জামা-কাপড়। লায়ন কিংয়ে লায়ন কিংয়ে সয়লাব।

আমি নুহাশকে নিয়ে ঘরে বসে রইলাম। তাকে নিয়ে ছবি দেখতে যাওয়া যাবে না। হলের বাতি নেভার সঙ্গে সঙ্গে সে বলবে, 'অন্ধকার হচ্ছে কেন?' তারপরই বিকট কান্না শুরু করবে। ইদানীং তার অন্ধকার ফোবিয়া হয়েছে।

মা এবং বোনেরা যে তাকে ফেলে চলে গেছে তা নিয়ে তাকে বিচলিত হতে দেখলাম না। সে এক হাতে পটেটো চিপস-এর প্যাকেট নিয়ে বিড়ালছানার পেছনে পেছনে ছোটাছুটি শুরু করল। আমার কিছুই করার নেই। বই পড়ব সে উপায় নেই। বইয়ে একবার মন বসে গেলে আশপাশের কোনো কিছু আমার খেয়াল থাকে না। সেই সময়ে নুহাশ রাস্তায় নেমে যেতে পারে। আমেরিকান বাড়িগুলো চারদিকে দেয়াল নেই, গেট নেই—বাচ্চাদের রাস্তায় নেমে যাওয়া খুব সহজ।

লায়ন কিং দেখে ওরা ফিরল ছ'টার সময়। বাচ্চারা অভিভূত। এত সুন্দর ছবি তারা নাকি জীবনে দেখে নি। এখন পর্যন্ত তারা যা দেখেছে সবই নাকি এই ছবির কাছে তুচ্ছ। বিপাশা ঘোষণা করল সে আরেকবার লায়ন কিং না দেখে আমেরিকা থেকে যাবে না, প্রয়োজনে সে তার নিজের টাকা থেকে টিকিট কাটবে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল ছবি দেখার পর সবাই একসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্যাস্ত দেখব। বাচ্চারা যেতে রাজি হলো না। তাদের মাথায় তখনো ঘুরছে লায়ন কিং। তারা গোল হয়ে বসে সিংহের কাণ্ডকারখানার গল্প করবে। সমুদ্রে সূর্যাস্ত এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কক্সবাজারে সেই দৃশ্য অনেকবার দেখা হয়েছে।

ওদের ছাড়াই আমি রওনা হলাম। বাচ্চাদের মা'রও মনে হয় সূর্যাস্ত দেখার ইচ্ছা ছিল না। আমাকে ফেলে ছবি দেখতে গেছে এই অপরাধবোদের কারণেই হয়তো সে রওনা হলো।

ফজলু গাড়ি চালাচ্ছে, আমি বসেছি তার পাশে। গুলতেকিন পেছনে। গাড়ি যাচ্ছে হানটিংটন বিচের দিকে। আমেরিকানরা বলে হানংটন। মাঝখানের 'টি' তারা উচ্চারণ করে না। আমেরিকান একসেন্ট আর ব্রিটিশ একসেন্টের অনেক তফাতের একটি হচ্ছে 'টি'-এর উচ্চারণ। আমেরিকানরা 'টি' উচ্চারণ করবে না, ব্রিটিশরা করবে। আমেরিকানরা 'ওয়াটরকে' বলবে 'টি' বাদ দিয়ে—। সে এক আশ্চর্য কৌশল।

যাই হোক, আমরা বিচের দিকে যাচ্ছি। ফজলু আমাকে বুঝাচ্ছে ফ্রাইওয়ে এবং হাইওয়ের ভেতর তফাতটা কী। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল আকাশে। আকাশের গায়ে কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

যেন লেখা হচ্ছে—লেখা ঠিক না, ছবি আঁকা হচ্ছে। ব্যাপারটা কী ? এই জিনিস তো আগে দেখি নি। ফজলু বলল, প্রচুর ডলার খরচ করে আমেরিকানরা মাঝে মাঝে আকাশে ছবি আঁকে, ম্যাসেজ লেখে। ব্যাপারটা করা হয় ধোঁয়া দিয়ে। প্লেন থেকে ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে লেখার কাজটা করা হয়।

কী ধরনের লেখা ?

এই পদ্ধতি সাধারণত ছেলেরা মেয়েদের মন জয় করার জন্য ব্যবহার করে। যেমন একটা হার্ট এঁকে তার নিচে লেখা হলো—'এলিজাবেথ, অ্যাই লাভ ইউ।' এলিজাবেথ যখন আকাশের গায়ে এই লেখা দেখল তখন সংগত কারণেই তার মন দ্রবীভূত হলো।

বাহ্, চমৎকার তো!

প্রপোজ করার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। বিকেলের দিকে হঠাৎ দেখবে আকাশে লেখা, 'ক্যাথিরিন, উইল ইউ মেরি মি ?—বব।'

টাকা কেমন লাগে ?

প্রচুর লাগে। উদ্ভট কোনো কিছুতে খরচ করতে আমেরিকানরা পিছপা হয় না।

উদ্ভট বলছ কেন, আমার কাছে তো খুবই মজা লাগছে।

মজা লাগলে পাঁচ হাজার ডলার খরচ করে তুমিও একটা ম্যাসেজ দিয়ে দাও।

আমি এবং গুলতেকিন গভীর আগ্রহ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। কী লেখা হয় দেখার চেষ্টা করছি। যে লিখছে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ প্রচণ্ড বাতাস। বাতাসে লেখা মুছে যাচ্ছে।

গুলতেকিন বলল, এত ঝামেলা, এত অর্থ ব্যয়ের পর যে বিয়ে সেই বিয়ে হয় ক্ষণস্থায়ী, এটাই আশ্চর্য।

ফজলু বলল, আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে, ওদের কাছে না। ওদের কাছে এটাই স্বাভাবিক। ওরা বলে, আমরা যতক্ষণ একসঙ্গে থাকি তীব্র ভালোবাসা নিয়ে থাকি। মোটামুটি ধরনের ভালোবাসা নিয়ে চল্লিশ বছর পাশাপাশি বাস করার চেয়ে তীব্র ভালোবাসা নিয়ে চার বছর জীবনযাপন করা অনেক ভালো।

আকাশে লেখা শেষ হয়েছে। দুটা প্রকাণ্ড হার্ট। হার্টের নিচে লেখা—'লুসি, ডোন্ট গো অ্যাওয়ে।'—লুসি চলে যেয়ো না।

লুসি কে আমরা জানি না। বান্ধবী না স্ত্রী ? না জানলেও আমরা বুঝতে পারি, লুসি বলে একজন কেউ ছিল, সে চলে যেতে চাচ্ছে। তাকে আটকানোর জন্য আকাশোর গায়ে চিঠি লেখা হলো। হৃদয়ের হাহাকার ছড়িয়ে দেওয়া হলো আকাশে।

প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সমুদ্র এবং আকাশ! এই ভয়াবহ সৌন্দর্যের ভেতর এক আমেরিকান যুবক কেঁদে কেঁদে বলছে, 'লুসি, ডোন্ট গো অ্যাওয়ে।'

আমি এবং গুলতেকিন মন খারাপ করে আকাশের গায়ে লেখার দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা দুজনই মনে মনে বললাম, লুসি তুমি যেয়ো না। তুমি থাকো। তুমি থাকো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

নিলামওয়ালা ছ' আনা

নিলামওয়ালা ছ' আনার দোকান এখন নেই। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এই জাতীয় দোকান ছিল। রঙ-বেরঙের জিনিস দিয়ে দোকানগুলো থাকত ঠাসা। দোকানির হাতে থাকত ঝুমঝুমি, মাথায় সঙ-এর টুপি। সে প্রাণপণে ডুগডুগি বাজিয়ে চিৎকার করত—

নিলামওয়ালা ছ' আনা
যা নিবি তাই ছ' আনা

আমেরিকায় গিয়ে আমার বাচ্চারা নিলামওয়ালার দোকান খুঁজে পেল। এদের স্থানীয় নাম নাইন্টি নাইন সেন্ট স্টোর। দোকানের সব জিনিসের দাম নাইন্টি নাইন সেন্ট। এক সেন্ট বেশি নয়, এক সেন্ট কমও নয়। আমেরিকার সব শহরে এ জাতীয় দোকান আছে—একাধিক আছে। এদের বিক্রিও ভালো। আমার ধারণা, এরা যেখানে যত বাজে জিনিস বা নকল জিনিস পায় কিনে নিয়ে এসে দোকানে সাজায়। নয়তো কী করে চুলের শ্যাম্পু নাইন্টি নাইন সেন্টে দেবে? বাইরে যার দাম ৩-৪ ডলার...।

যাই হোক, আমার তিন কন্যা দোকান দেখে মুগ্ধ। যা-ই দেখে তা-ই তাদের মনে ধরে যায়। ওই যে চুলের ক্লিপ, কী সুন্দর! কী সুন্দর! ওই যে সাবান। ওমা, কী সুন্দর কাচের বাক্সে সাবান! ঘুড়ি পাওয়া যাচ্ছে, ঘুড়ি কিনে নিয়ে যাব। দেশে নিয়ে ওড়াব।

ক্লিপ কেনা হলো, সাবান কেনা হলো, ঘুড়ি কেনা হলো। একজন যা কিনবে বাকি দুজন তা-ই কিনবে... দোকানময় ছোটাছুটি। মেয়েদের মা কড়া ধমক দিল—করছ কী তোমরা? আজেবাজে জিনিস দিয়ে সুটকেস বোঝাই করছ। মেজো মেয়ে বলল, তুমি চুপ করে থাকো, বাবা বলেছে আমেরিকায় আমরা যা কিনতে চাই কিনতে পারব। তুমি আর বাবা দুজন দোকানের বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াও না। কড়া চোখে তাকিয়ে থাকলে কিনব কী করে?

আমি বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। গুলতেকিনকে দোকানে রেখে গেলাম যদি সে মেয়েদের কেনাকাটা বলে কয়ে কিছু কমাতে পারে। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম, সে নিজেও জিনিস কেনায় লেগে পড়েছে। তার হাতেও একটা শপিং কার্ট। সেটিও মেয়েদের মতোই উপচে পড়ছে।

এক মেয়ে হয়তো কিছু-একটা পেয়ে শপিং কার্টে ভরল, অমনি বাকি দুবোন এবং তাদের মা ছুটে গেল সেদিকে। সেই জিনিস চারটা উঠে এল চারজনের শপিং কার্টে।

ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমেরিকান দোকানগুলোর সাজানোর কায়দা অসাধারণ। অতি তুচ্ছ জিনিসও এরা এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখবে, এত সুন্দর করে তার ওপর আলো ফেলবে, এমন লোভনীয় করবে যে দেখামাত্রই মনে হবে—কিনে ফেলা যাক। এরা পৃথিবীর সেরা সেলসম্যান। ক্রেতার সাইকোলজি নিয়ে এদের গবেষণার অন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

নেই। সুন্দর করে জিনিস সাজিয়েই তারা বসে নেই; দোকানে বাজছে মিউজিক, যে মিউজিক ক্রেতাকে জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ করবে (গবেষণা করে বের করা)। মিউজিকের ফাঁকে ফাঁকে আছে সাবলাইন ইনফরমেশন—অর্থাৎ কানে শোনা যায় না এমন ফ্রিকোয়েন্সিতে বলা হবে—কিনে ফেলো, জিনিস কিনে ফেলো। সেই বাণী ক্রেতাকে সাব কনসাস স্তরে প্রলুব্ধ করবে। মিউজিকের সঙ্গে আছে সুঘ্রাণ। যে ঘ্রাণও দর্শককে কাছে টানবে। আপনি হয়তো কোনো কিছুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, কিছুক্ষণের মধ্যে রূপবতী তরুণী সেলসগার্ল এসে বলবে, আমি কি তোমাকে কেনাকাটায় সাহায্য করব ? আপনি যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলেই সর্বনাশ। একপর্যায়ে দেখা যাবে, একগাদা জিনিসপত্র কিনে বসে আছেন, যার কোনোটিই আপনার দরকার নেই।

গুলতেকিন একবার একটা লিপস্টিক কেনার জন্য গিয়েছে। যথারীতি এক তরুণী গেল তার সাহায্যে। তাদের কথোপকথনের অংশবিশেষ এরকম :

সেলসগার্ল : তুমি এই রঙ পছন্দ করেছ ? বাহ্ তোমাকে এই রঙে খুব মানাবে। তোমার যা সুন্দর চেহারা—এই রঙের সঙ্গে একটা গাঢ় রঙ নিয়ে নাও। পার্টিতে পরবে।

গুলতেকিন : গাঢ় রঙ আমি পরি না।

সেলসগার্ল : ঠোঁটে দিয়ে আয়নার সামনে একটু দাঁড়াও—আমি দেখি তোমাকে কেমন লাগে। মাঠে আয়না।

(ঠোঁটে লিপস্টিক দেওয়া হলো। আয়নার সামনে দাঁড়ানো হলো)

সেলগার্ল : তোমাকে তো প্রিন্সেসের মতো লাগছে—ও মাই গড!

গুলতেকিন : দাও, আমাকে গাঢ় রঙের একটা দাও।

সেলসগার্ল : একটা নেবে ? তিনটা একসঙ্গে কিনলে কমিশন আছে...।

গুলতেকিন : দাও, তিনটাই দাও।

সেলসগার্ল : মেকাপের আগে ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে হয়। তুমি ক্লিনজার নিয়েছ ?

গুলতেকিন : আমার ক্লিনজার লাগবে না।

সেলসগার্ল : আমরা কিন্তু সেলে দিচ্ছি। স্পেশাল সেল শুধু এই সপ্তাহের জন্য...।

গুলতেকিন : দেখি জিনিসটা কেমন ?

ঘণ্টাখানিক পর গুলতেকিন দোকান থেকে বের হলো। তার ব্যাগভর্তি মেকাপের জিনিস। একসঙ্গে এত টাকার জিনিস কিনে ফেলার জন্য মুখে অপরাধবোধের হাসি। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিকের কারণে পরিচিত হাসিও আমার কাছে লাগছে অপরিচিত।

কেনাকাটার সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো দরদামে দোকানির সঙ্গে ক্রেতার যুদ্ধে। সেই আনন্দ থেকে আমেরিকানরা আমাদের বঞ্চিত করছে। এ দেশে দরদামের উপায় নেই—জিনিসের গায়ে যা লেখা তা-ই দিতে হবে। তবে ব্যতিক্রম আছে—চায়নিজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

বেচাকেনায় নতুন ধারা নিয়ে এসেছে—হাগলিংয়ের ধারা। নিউইয়র্কে চায়না টাউনের চারপাশের এলাকার দোকানগুলোতে চলে ওরিয়েন্টাল ধাঁচে কেনাবেচা। দোকানিরা আকাশছোঁয়া দাম হাঁকছে, আপনি পাতাল ঘেঁষে একটা দাম বলবেন। দড়ি টানাটানি চলতে থাকবে। খোদ আমেরিকায় এই অভিজ্ঞতা হলো ঝাড়বাতি কিনতে গিয়ে।

নিউইয়র্কের বাউরি বলে একটা জায়গায় ঝাড়বাতির দোকান। একটা দু'টো না, অসংখ্য। দোকানের মালিক বেশির ভাগই চায়নিজ, অল্প কিছু ইহুদি। আমরা একটা দোকানে ঢুকলাম। আমাদের সঙ্গে আছেন এমন এক এক্সপার্ট বাঙালি, যিনি এই অঞ্চলে কেনাকাটার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। দোকানে ঢোকামাত্র এক চায়নিজ মহিলা (দোকানের মালিক) হাসিমুখে উঠে এলন। মুখভর্তি হাসি দিয়ে দীর্ঘদিনের পরিচিতের মতো বললেন, তোমরা কেমন আছ?

আমরা কেমন আছি সেটা জানালাম এবং একটা ঝাড়বাতি দেখতে এসেছি সেটাও জানানো হলো।

পছন্দ করো। যেটা তোমার ভালো লাগে সেটাই আজ তোমাদের আমি দিয়ে দেব। তোমাদের আমার পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হয়েছে কেন?

বুঝতে পারছি না। তোমাদের চেহারার মধ্যে কী যেন আছে। রহস্য আছে। আচ্ছা শোনো, তোমরা কি চায়নিজ?

আমার সঙ্গের এক্সপার্ট বাঙালি বললেন, আমি পুরোপুরি চায়নিজ না, তবে আমার শরীরে খানিকটা চায়নিজ রক্ত আছে। আমার গ্রান্ডফাদারের ফাদার ছিলেন চায়নিজ।

হাউ নাইস!

এই ঝাড়বাতিটা আমার পছন্দ, এর দাম বলো।

দাম বলব কী, দাম তো লেখাই আছে।

লেখা আছে দু' হাজার ডলার। একটা খেলনার দাম তো আর দু' হাজার ডলার হতে পারে না।

খেলনা মানে? তুমি কী বলছ! এগুলো লেড ক্রিস্টেল। থার্টি পারসেন্ট লেড।

এক শ' পারসেন্ট লেড হলেও এর দাম দু' হাজার ডলার হবে না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি পঞ্চাশ ডলার কম দাও। এই খাতিরটা শুধু তোমাকেই করছি—তোমার শরীরে আছে চায়নিজ ব্লাড।

আমি তিন শ' ডলারের বেশি এক সেন্টও দিতে পারব না।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।

মোটেই ঠাট্টা করছি না। ঠাট্টা করছ তুমি। দু' শ ডলারের জিনিস দু' হাজার ডলার চাচ্ছ।

আমরা দোকান থেকে বের হওয়ার ভঙ্গি করতেই মহিলা কাউন্টার ছেড়ে এসে এক্সপার্ট বাঙালির হাত ধরে ফেলে আদুরে গলায় বলল, ও কী, রাগ করছ কেন? আচ্ছা যাও, ফর ইউ ওনলি—ওয়ান থাউজেন্ড ডলার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমি হতভম্ব। বলে কী! এক ধাক্কায় দাম দু' হাজার ডলার থেকে এক হাজারে নেমে এল—আরও কত নামবে কে জানে!

এই পদ্ধতির বেচাকেনা আমেরিকায় জনপ্রিয় হওয়ার কথা নয়। দরদাম করে নষ্ট করার সময় এদের নেই। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণই প্রাচ্যদেশীয়, যেখানে সবার হাতেই অফুরন্ত সময়। তারপরেও এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। চায়নিজরা চুটিয়ে ব্যবসা করছে। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয়রা। আমরা বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। ওপি ওয়ানের বাঙালিদের বেশ একটা বড় অংশ নেমেছেন ব্যবসায়। ফেরি করা ব্যবসা। কিছু মালপত্র নিয়ে ফেরি করা। এদের ব্যবসা-পদ্ধতি ভিন্ন। খোদ নিউইয়র্ক শহরে ওপি ওয়ানে আসা জনৈক বাঙালি গরম গরম সিঙ্গাড়া ভেজে বিক্রি করেন। টু ফর এ ডলার। তেঁতুলের চাটনি দিয়ে প্লেটে দুটা সিঙ্গারা দিয়ে দেওয়া হয়। সাহেব-মেমরা তেমন খায় না। স্প্যানিশরা খায়, কালো আমেরিকানরা খায়। সিঙ্গাড়ার রমরমা ব্যবসা।

নাইন্টি-নাইন সেন্ট দোকানের কথায় ফিরে যাই। আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের কেনাকাটা শেষ হলো—আমি দাম দিতে গেলাম। ক্রেডিট কার্ড নেই। নগদ পয়সায় দাম দেব। এক শ' ডলারের একটা নোট দিলাম। দোকানি নানা পদ্ধতিতে সেটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কী একটা কলমে নোটে দাগ দিয়ে দেখল জাল নোট কি না। নিশ্চিত হয়ে ভাঙতি ফেরত দিল এবং এত কিছু কেনার জন্য উপহারস্বরূপ আমাকে এক প্যাকেট তাস দিল। হোটেলে ফিরে এসে দেখি, সেই তাসের প্যাকেটে কোনো সাধারণ তাস নেই। আছে অসাধারণ তাস। বাহান্নটা তাসে বাহান্নটা সম্পূর্ণ নগ্ন নারী। বাহান্নজন অপূর্ব মায়াবতী বাহান্নটা ভয়ংকর পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। কী সর্বনাশ!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

কোস্ট টু কোস্ট

আমেরিকা সিবিএস টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের নাম 'ডেভিড লিটারম্যান শো'। প্রতি সোমবার রাতে ডেভিড লিটারম্যান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। হালকা বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান—কথাবার্তা, মজার মজার ইন্টারভিউ, রসিকতা...। বিল ক্লিনটনের মতো ব্যক্তিত্ব যেমন এই অনুষ্ঠানে আসেন, তেমনি আসেন সাধারণ সব মানুষ—রেস্টুরেন্টের ওয়েটার থেকে রাস্তার পাশের দোকানের সামান্য এক সেলসম্যান। যেমন এসেছিলেন মুজিবর ও সিরাজুল নামের দুই বাংলাদেশি। দুজনের চেহারায় এবং কথাবার্তায় 'হাবাটাইপ' একটা ব্যাপার আছে (মুজিবর ও সিরাজুল সাহেব, মন্তব্যের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি যেমন শুনেছি তেমন লিখছি)।

সিবিএস ইন্টারভিউ করছিল মুজিবরকে। মুজিবর সাহেবের ইংরেজি তেমন আসে না। তারপরেও তিনি প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুরু করেন—কিন্তু শেষ করতে পারেন না। তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে জবাব দিয়ে ফেলেন সিরাজুল। একপর্যায়ে আহত হয়ে মুজিবর সাহেব অন্য এক দৃষ্টিতে তাকালেন সিরাজুলের দিকে। সেই দৃষ্টিতে ছিল অভিমান, ক্ষোভ, রাগ, খানিকটা ঘৃণা। বলা হয়ে থাকে, মুজিবর যে Look দিয়েছিল সেই Look হলো মিলিয়ন ডলার Look, দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেল।

ডেভিড লিটারম্যান পরের অনুষ্ঠানে আবার এই দুজনকে নিয়ে এলেন। তার পরের অনুষ্ঠানে আবার। আমেরিকান দর্শক এই দুই বাংলাদেশির কথাবার্তায়, হাবভাবে মুগ্ধ, বিস্মিত, যেন নতুন আঙ্গিকে আবার ফিরে এসেছে লরেল অ্যান্ড হার্ডি। দুই কমেডিয়ান জুটি। না, তারা কোনো রসিকতা করে না, মজার গল্প করে না। তারা নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে, তাদের সুচিন্তিত (?) অভিমত দেয়—এতেই আমেরিকান দর্শক হেসে কুটিকুটি। এই দুই বাংলাদেশি রাতারাতি হয়ে গেল সিবিএস টিভির সুপারস্টার। দুজনকে কিছুদিনের জন্য টিভিতে ডাকা হয় নি—সেই কিছুদিন সিবিএস-এর রেটিং আশঙ্কাজনকভাবে নেমে গিয়েছিল। কাজেই তাদের জন্য চালু করা হলো ডেভিড লিটারম্যান শো'র বিশেষ একটা অংশ। সেই অংশের নাম 'কোস্ট টু কোস্ট'। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হলো—আমেরিকার পথে-প্রান্তরে দুই বাংলাদেশি বন্ধু টিভির খরচায় পুরো আমেরিকা ঘোরে। তাদের সঙ্গে থাকে টিভি ক্রু, ক্যামেরা। তারা থাকে পাঁচতারা হোটেলে। ডেভিড লিটারম্যান শো যখন শুরু হয় তখন দুজন যেখানে থাকে সেখান থেকে তাদের ইন্টারভিউ সম্প্রচার করা হয়। ইন্টারভিউর নমুনা দিচ্ছি। 'কাস্ট টু কোস্ট' অনুষ্ঠান শুরু হলো। ডেভিড লিটারম্যান বললেন—

আসুন টিভি দর্শকরা, দেখা যাক মুজিবর-সিরাজুল কী করছে।

পর্দায় দু'জনের হাসিমুখ দেখা গেল। দুজনই স্নানের পোশাক পরে ফ্লোরিডায় সমুদ্রস্নান করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ডেভিড লিটারম্যান : কেমন আছ মুজিবর ?

মুজিবর : ভেরি গুড, থ্যাঙ্ক ইউ।

সিরাজুল : আই অ্যাম অলসো ভেরি গুড। থ্যাঙ্ক ইউ।

আমেরিকান দর্শকদের আনন্দ কে দেখে! হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এক-একজনের চোখে হাসির কারণে পানি পর্যন্ত এসে গেল...

মুজিবর ও সিরাজুলের জনপ্রিয়তার একটি নমুনা হচ্ছে, এরা পথে বের হতে পারে না। আমেরিকানরা তাদের ছেঁকে ধরে। অটোগ্রাফ চায়। অটোগ্রাফ দিতে দিতে দুই বন্ধুর ডান হাতের মাংসপেশিতে টান পড়ে। এদের ছবি লাগানো টি-শার্ট বিক্রি হয়, পোস্টারও পাওয়া যায়। এমনই অবস্থা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে—বেশিরভাগ বাঙালি মুজিবর ও সিরাজুলের ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারে নি। তাদের ধারণা, এই দুজনের ভুল-ভাল ইংরেজি, হাবার মতো হাবভাব বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে। এ ধরনের বক্তব্য নিয়ে বেশ কিছু চিঠি *নিউইয়র্ক টাইমস*সহ নানা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

অষ্টম নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ সম্মেলনে আমাকেও প্রশ্ন করা হলো, এই যে দু'জন ভাঁড়ামি করছে এবং বাংলাদেশের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে, এ প্রসঙ্গে আপনার প্রতিক্রিয়া কী ?

আমি বললাম, আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খুব মজার মনে হচ্ছে।

এরা দু'জন যেভাবেই হোক আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করেছে। ভাঁড়ামি করছে কি না আমি জানি না, করলেও ক্ষতি নেই। ভুল-ভাল ইংরেজি বলছে ? তাতে কী হয়েছে ? আমেরিকানরা যখন বাংলা শেখে, বাংলা বলে, তখন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভুল-ভাল বলে। তাতে যদি তাদের অপমান না হয় আমাদের অপমান হবে কেন ?

খুব আগ্রহ নিয়ে ডেভিড লিটারম্যান শো এক রাতে দেখলাম। দুই বন্ধুর কথাবার্তা শুনলাম। আমার কাছে মনে হলো, এরা দুজন সহজ-সরল ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সঙ্গে ডেভিড লিটারম্যানের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। এর বেশি কিছু না।

কে জানে, সহজ-সরল আন্তরিক কথাবার্তাই বোধহয় এখনকার আমেরিকানদের কাছে খুব ফানি মনে হয়। হাসতে হাসতে তারা বিষম খেতে থাকে।

মুজিবর ও সিরাজুলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

তারা কেমন আছে ?

আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের আমি তিন ভাগে ভাগ করেছি। প্রথম ভাগে আছেন বাংলাদেশের সেরা ছেলেমেয়েরা। এঁরা বিভিন্ন সময়ে পিএইচডি করার জন্য দেশ ছেড়েছেন। কেউ এসেছেন অ্যাসিস্টেন্টশিপ নিয়ে, কেউ স্কলারশিপে। ডিগ্রি হওয়ার পর দেশে ফিরে যান নি। আমেরিকার মূল স্রোতে দ্রুত মিশে যেতে চেয়েছেন। তারা সবাই খুব ভালো অবস্থায় আছেন। গাড়ি, বাড়ি, টাকাপয়সা সবই হয়েছে। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ করতে পেরেছেন। পারবারই কথা। আগেই বলেছি, এঁরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের স্বর্ণ ফসল। আমরা এঁদের ধরে রাখতে পারি নি—কিংবা বলা চলে, এঁরা আমাদের ধরে রাখতে চান নি। দেশ এবং দেশের মানুষের চেয়ে তাদের কাছে ব্যক্তিগত সাফল্য বড় মনে হয়েছে।

ছুটিছাটায় দেশে না গিয়ে এঁরা ইউরোপ ট্যুরে যেতে বেশি পছন্দ করেন। কারণ দেশের প্রতি মমত্ববোধের অভাব নয়, কারণ হলো—দেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। দেশের নোংরা পানি খেয়ে ডায়রিয়া হতে পারে। জীবাণুতে গিজগিজ করছে এমন জায়গায় ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া কি ঠিক ? দেশ প্রিয়। দেশের জীবাণু প্রিয় নয়।

দ্বিতীয় দলে আছেন—ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে থেকে যাওয়া মানুষ, জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে সাঁতরে ওঠা মানুষ, আন্ডারগ্রাউন্ডে পড়তে আসা অ্যাডভেঞ্চার-পিপাসী ছেলেমেয়েরা। দেশ এঁদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। এরা সারাক্ষণই দেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। যেতে পারেন না, কারণ তাঁরা সবাই প্রায় ইল্লিগ্যাল অ্যালিয়েন। অনেকের কাছেই দেশে ফেরার টাকা নেই। তাঁরা আমেরিকার মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেন না। নিজেরা নিজেরা জোট বেঁধে একসঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন। ছুটিছাটায় সবাই একত্র হয়ে ইন্ডিয়ান স্টোর থেকে ইলিশ মাছ কিনে এনে ভাজা করেন। ইলিশ মাছ ভাজা মুখে দিয়ে করুণ গলায় বলেন, আহা, যদি সাতদিনের জন্য দেশে যেতে পারতাম!

তৃতীয় দলে আছেন ওপি-ওয়ানরা। এরা দলে দলে দেশ ছেড়ে এ দেশে এসেছেন। আইনসংগতভাবে এসেছেন। এই দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যেমন আছেন—রিকশাওয়ালাও আছেন। নতুন দেশে তাঁরা কেমন আছে তাই নিয়ে এই লেখা।

যখন ওপি-ওয়ান শুরু হলো তখন দেশে খুব হইচই। সবাই মজা পাচ্ছে। লাখ লাখ মানুষ ওপি ওয়ান-এর ফরম ফিলআপ করছে। ফরম বিক্রি হচ্ছে যেখানে সেখানে। ফরম ফিলআপ করার কায়দাকানুন বাতলে দিতে কোম্পানি গজিয়ে গেছে। পত্রিকায় মজার মজার সচিত্র ফিচার—কাজের বুয়া ওপি-ওয়ান-এর ফরম ফিলআপ করে—আমেরিকার স্বপ্ন দেখছে। ৮০ বছরের চোখে ছানিপড়া বৃদ্ধ ফরম ফিলআপ করছে। লেখাপড়া জানে না, নাম সই যেখানে করার কথা সেখানে টিপসই করছে। তাদের নিয়ে কত হাসাহাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

অথচ যে দলটিকে নিয়ে হাসাহাসি হওয়ার কথা তাদের নিয়ে কোনো হাসাহাসি নেই। সেই দলে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি বড় আমলা।

যারা নিতান্তই দরিদ্র, জীবন যাদের কিছুই দেয় নি, তারা তো ভাগ্য উন্নয়নের স্বপ্ন দেখবেই। তাদের নিয়ে আমরা হাসাহাসি করব কেন? এই ব্যাপারটা কখনোই আমার মাথায় আসে নি। আমার কিছু অতি কাছের বন্ধু বিরক্ত মুখে বলেছেন, ক অক্ষর শূকর মাংস। এরা আমেরিকায় গিয়ে করবে কী? ভিক্ষা যে করবে সে উপায়ও তো নেই—আমেরিকায় কেউ ভিক্ষা দেয় না।

আমার সবসময় মনে হয়েছে এদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না। এদের মাথায় আছে বুদ্ধি, চোখে আছে স্বপ্ন। এরা কাজ করতে পারবে, পরিশ্রম করতে পারবে, এরা টিকে যাবে।

আমেরিকায় নেমেই আমি এদের সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না, কারণ আমি যাদের সঙ্গে আছি—তারা প্রথম ভাগের। দেশের সেরা প্রবাসী সন্তানেরা। এরা ওপি-ওয়ানওয়ালাদের ব্যাপারে কিছু জানে না। জানার তেমন প্রয়োজনও বোধ করে না। মনে হয় তারা ওপি-ওয়ানওয়ালাদের নিয়ে খানিকটা লজ্জিত। আমরা যেমন বড়লোক বন্ধুদের কাছে গরিব আত্মীয়দের দেখাতে লজ্জা বোধ করি—সে রকম। শুধু জানলাম তারা আছে—ভালোই আছে—কেউ ওয়েল ফেয়ারে নেই। কাজ করছে।

শুরুতে অসুবিধা হয় নি?

ঠিক জানি না। হয়েছে হয়তো।

শুনতে পেলাম নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *প্রবাসী* পত্রিকায় এদের বিষয়ে অনেক লেখা ছাপা হয়েছে। এদের অনেক চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে।

আমি প্রবাসী সম্প্রদায়কে অনুরোধ করলাম *প্রবাসীর* পুরোনো সব সংখ্যা আমাকে দিতে। নিউ জার্সির বাংলাদেশ সম্মেলনে খোঁজ করতে লাগলাম ওপি-ওয়ান এর কেউ এসেছে কি না। ওরাই ওদের কথা ভালো বলতে পারবে।

পেয়ে গেলাম—অনেকেই এসেছে। বাংলাদেশ সম্মেলনে তাদের আগ্রহ, তাদের আনন্দই সবচেয়ে বেশি। সেই অনেকের একটা বড় অংশ সম্মেলনে নাম রেজিস্ট্রি করে নি। রেজিস্ট্রেশন ফি কুড়ি ডলার দেওয়ার তাদের সামর্থ্য নেই। তারা মূল অনুষ্ঠানে ঢুকতে পারছে না—লবিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এতেই তারা খুশি। সবার হাতে সস্তা ধরনের ইন্সটেমেটিক ক্যামেরা। ঝপাঝপ ছবি তুলছে।

একজনকে দেখলাম গরমের মধ্যে থ্রিপিস স্যুট পরে এসেছে। গলায় চকচকে টাই। সে একফাঁকে আমাকে কানে কানে বলল, সাত হাজার ডলার জমিয়ে ফেলেছি স্যার।

খুব ভালো। কী করেন আপনি?

ছুটির দিনে ট্যাক্সি চালাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

খুব ভালো। দেশে কী করতেন?

কিছু করতাম না। বেকার ছিলাম।

পড়াশোনা কী করেছেন?

ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি।

উইকএন্ডে ট্যাক্সি চালান বললেন, সপ্তাহের অন্যদিনগুলোতে কী করেন?

সে লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে বলল, কলেজে ভর্তি হয়ে গেছি স্যার। নিউইয়র্কের সিটি কলেজ।

বাহ্ বাহ্।

আমি বললাম, আপনারা কেমন আছেন?

স্যার, আমরা ভালো আছি।

শুরুতে অসুবিধা হয় নি?

হয়েছে। এখন অসুবিধা নেই। কাজ করে খাই।

কী ধরনের কাজ?

ছোট কাজ। কেউ কেউ ব্যবসা শুরু করেছে। এরা ভালো করছে।

দেশের জন্যে কী করছেন আপনারা?

দেশের জন্য কিছু করতে পারছি না স্যার। এজন্য মনটা খুব খারাপ। কী করব বলে দেন।

আপনারা ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন। এতেই দেশের জন্য করা হবে।

দেশের অবস্থা কী স্যার?

ভালো। খুব ভালো।

এরা আমার কথা শুনে খুব খুশি।

আমার সবসময়ই মনে হয়েছে, আমাদের দেশের সেরা সন্তানরা দেশের জন্য তেমন কিছু করতে পারবে না, কিন্তু এরা করবে। এরা দেশে ডলার পাঠাবে। সেই ডলারে দেশের অর্থনীতি শক্ত হবে। দেশে কলকারখানা হবে। আমরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠব।

তাদের কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা—

স্যার, টিভিতে এখন ধারাবাহিক নাটক কি হচ্ছে?

খালেদা জিয়া দেশ কেমন চালাচ্ছেন?

আওয়ামী লীগ কি ক্ষমতায় যাবে?

গোলাম আযমকে ছেড়ে দিল কেন?

দেশে এখন চালের দর কত?

এবার নাকি ফসল ভালো হয়েছে?

গত সাইক্লোনে মানুষ কত মারা গেছে?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমি সব প্রশ্নের জবাবও দিতে পারছি না।

আমার এত ভালো লাগল। বাংলাদেশ তারা পেছনে ফেলে আসে নি। রুমালে বেঁধে পকেটে করে নিয়ে এসেছে। রুমাল খুলে সেই দেশকে তারা দেখে, মাঝে মাঝে সেই রুমালে তারা চোখ মোছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মরুভূমির জোছনা

যাঁরা আমার লেখালেখির সঙ্গে পরিচিত তাঁরা হয়তোবা আমার জোছনাপ্রীতির কথা জানেন। সূর্য থেকে ধার করা চাঁদের কৃত্রিম আলো আমাকে সবসময়ই অভিভূত করে। নানান পরিবেশে জোছনা দেখার জন্য এই জীবনে আমি অনেক পাগলামি করেছি। পানিতে জোছনা কেমন ফুটে দেখার জন্য এক রাত আমি বিলের ওপর বানানো টংঘরে ছিলাম। মাঝরাতে সেই টংঘর ভেঙে পানিতে পড়ে গিয়ে প্রায় জীবনসংশয় হয়েছিল। তারপরও মনে হয়েছে, এই অলৌকিক সৌন্দর্যের জন্য জীবনসংশয় করা যেতে পারে।

শান্ত পানিতে জোছনা, ভয়ংকর সমুদ্রে জোছনা, বনের ভেতর জোছনা, বরফঢাকা প্রান্তরে জোছনা, পাহাড়ের গায়ে জোছনা—সবই দেখা হয়েছে। শুধু দেখা হয় নি মরুভূমিতে জোছনা। দিগন্তবিস্তৃত বালি, মাঝে মাঝে সেন্ড ডিউনস, তার ওপর পড়ল জোছনার আলো। দৃশ্যটা কেমন হবে? দেখা হয় নি। দেখার খুব ইচ্ছা। হাতের কাছে ভারতের রাজস্থান—গোবি মরুভূমি। রাজস্থানে গেলাম। জোছনা দেখা হলো না। চাঁদের দিন-ক্ষণ হিসাব করে যাই নি।

এবারে আমেরিকা ভ্রমণে আগেভাগেই ঠিক করে রেখেছি, ভরা পূর্ণিমা কাটাব কোনো-একটা মরুভূমিতে। পূর্ণিমার সময়টা থাকব নাভাদা স্টেটে। সেখানে আছে মাহজি ডেজার্ট। ভয়াবহ মরুভূমি। মাহজি ডেজার্টেই পৃথিবীবিখ্যাত 'ভ্যালি অব ডেথ'। মৃত্যুর উপত্যকা। পৃথিবীর জনমানবশূন্য উত্তপ্ততম স্থানের একটি। ভরা পূর্ণিমা ভ্যালি অব ডেথ থেকে দেখলে কেমন হয়? সবাই বলল, বড় ধরনের পাগলামি হয়, আর কিছুই হয় না। ভ্যালি অব ডেথে অসহনীয় গরম ছাড়া আর কিছু নেই। গরম কী বুঝতে চাইলে ওভেনের ভেতর বসে থাকলেই হয়, ভ্যালি অব ডেথে যাওয়ার দরকার কী?

একজনকেও পেলাম না যে বলল, ভ্যালি অব ডেথে যাওয়া যেতে পারে—দর্শনীয় স্থান। তারপরেও ঠিক করলাম, যাব। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মাত্র পাঁচ শ' মাইল। এমন কিছু দূরে নয়। সমস্যা হলো, আমাকে নিয়ে যাবে কে? ভ্যালি অব ডেথে ট্যুর বাস যায় না। গাড়ি ভাড়া করতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমাকে গাড়ি চালাতে হবে। এক যুগ আগে আমেরিকায় গাড়ি চালিয়েছি। এক যুগ আগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এখন কাজে লাগবে না। বন্ধু-বান্ধবের কেউ আমাকে গাড়ি করে নিয়ে যেতে রাজি হলো না। কাজেই মনের দুঃখ মনে চেপে ভ্যালি অব ডেথে যাওয়া বাতিল করলাম। আর দশজন ট্যুরিস্টের মতো ভ্যালি অব ডেথে না গিয়ে রওনা হলাম লাস ভেগাসে। প্রকৃতি তখন আমার সঙ্গে একটা মজা করল। সম্পূর্ণ ভরা জোছনায় ভ্যালি অব ডেথের পাশে দিগন্তবিস্তৃত বালিরাশির কাছে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। কীভাবে করল সেই গল্পটা বলি।

লাস ভেগাস থেকে ভ্যান-এলেন কোম্পানির ট্যুর বাসে ফিরছি। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে আমি, একদল জাপানি, কিছু আমেরিকান বুড়োবুড়ি। লাস ভেগাসের হোটেল আলাদীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

থেকে সন্ধ্যা ছটায় বাস ছেড়েছে। বিশাল বাস, দোতলা, সমান উঁচু ছাদ। আরাম-আয়েসের ঢালাও ব্যবস্থা। একজন মহিলা অ্যাটেনডেন্ট কিছুক্ষণ পর পর যাত্রীদের চা কফি দিচ্ছে। মদ্যপানের ব্যবস্থাও আছে। সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার দেওয়া হলো। বেশ ভালো খাবার। খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমাচ্ছে। আমেরিকান বাসগুলোতে চড়লেই ঘুম পায়। আমি জেগে আছি। রিডিং লাইট জ্বালিয়ে বই পড়ার চেষ্টা করছি। পড়ে আরাম পাচ্ছি না। দার্শনিক ধরনের বই, আর্নেস্ট ক্যারনের—*In Search of God.* চলন্ত বাসে এই বই পড়া যায় না। চলন্ত বাসে পড়তে হয় রগরগে ডিকেটিভ বই, যার পাতায় পাতায় খুন-খারাবি।

ড্রাইভার বলল, আমরা মাহজি ডেজার্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। পাশেই ভ্যালি অব ডেথ। জানলা দিয়ে তাকাও, বিশাল এক থার্মোমিটার দেখবে। থার্মোমিটারে লেখা ১৩৮। কারণ গত বছর ভ্যালি অব ডেথে ১৩৮ ডিগ্রি তাপ উঠেছিল। এটিই রেকর্ড তাপমাত্রা। কাজেই বিষয়টি স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৩৮-এর থার্মোমিটার বানানো হয়েছে।

যাত্রীদের মধ্যে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না, কারণ তারা ফিরছে লাস ভেগাস থেকে। লাস ভেগাস-ফেরত যাত্রীদের চিন্তাচেতনা কিছুটা ভোঁতা হয়ে থাকে। তারা উত্তেজিত হওয়ার ক্ষমতা সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে।

হঠাৎ ঘ্যাস করে শব্দ হলো। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার লজ্জিত গলায় বলল, গাড়ির ট্রান্সমিশনে সামান্য সমস্যা হচ্ছে। এরা দেখে নিচ্ছি। তোমরা কেউ যদি একটু হাত-পা নাড়াতে চাও নাড়াতে পার। যারা সিগারেট খাও তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। নিচে নেমে সিগারেট খেতে পারবে।

আমি সিগারেট টানার লোভেই গাড়ি থেকে নামলাম। নেমেই হতভম্ব—এ কী! আকাশে ভরা পূর্ণিমা চাঁদ। চারদিকে মরুভূমি। এই তো একটু দূরেই ভ্যালি অব ডেথ। আজ পূর্ণিমা, তা তো মনে ছিল না।

সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি দেখার কোনো উপায় নেই। মানুষকে সে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তবে সৃষ্টিকর্তাকে অনুভব করতে চাইলে করা যায়। আগে একবার বলেছি, এখনো একবার বলছি, সৃষ্টিকর্তা তাঁর নানান সৃষ্টির ভেতর নিজেকে প্রকাশ করেন। আমি তাঁর প্রকাশ দেখলাম মরুভূমির জোছনায়। এই জোছনা সম্পূর্ণ আলাদা—এই জোছনা মানুষের ভেতর শূন্যতা ও হাহাকার জাগিয়ে তোলে। তীব্র ভয়ের এক ধরনের অনুভূতি হয়, নিজেকে অসহায় লাগে।

আমি মাহজি ডেজার্টে জোছনা দেখছি। এই রূপের বর্ণনা করি সেই ক্ষমতা আমার নেই। কিছু কিছু দৃশ্য আছে যা বর্ণনায় ধরা পড়ে না, যাকে ধরতে হয় চেতনার উপলব্ধিতে। আমার সঙ্গে দামি ক্যামেরা আছে। হাজার চেষ্টাতেও সেই ক্যামেরায় আমি যেমন জোছনার এই রূপ ধরতে পারব না, ঠিক তেমনি আমার সঙ্গে যেসব কলম আছে, তা দিয়েও আমি এই জোছনার বর্ণনা করতে পারব না। এত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। চারদিক চকচক করছে বালি। জোছনা বালিতে প্রতিফলিত হয়ে এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করছে। সমুদ্রসম বালুকারাশিতে আছে বিচিত্র সব ক্যাকটাস। ক্যাকটাসের গায়ে জোছনা পড়েছে। এদের গায়ের কাঁটাগুলো দিনের আলোয় এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, জোছনায় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠল। হাওয়ার সঙ্গে বালি উড়ছে, বালির সঙ্গে বালির গায়ে গায়ে জোছনা উড়ছে। যেন মরুভূমির হাওয়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জোছনা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য পৃথিবীর দৃশ্য নয়। এ এক অলৌকিক দৃশ্য।

ড্রাইভার বলল, গাড়ি ঠিক হয়েছে, উঠে এসো। আমি উঠে এলাম। এত তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে হলো বলে আমার মনে কোনো আফসোস হলো না, কারণ ভয়াবহ সৌন্দর্যের সামনে বেশিক্ষণ থাকতে নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

শুভঙ্করের ফাঁকি

প্রবাসী বাঙালিদের একটা ব্যাপার আমার খুব পছন্দ হলো। এরা তাদের বাবা-মাকে নিয়ে এসে মাসখানেক সঙ্গে রেখে দেশে পাঠিয়ে দেয়, আবার বছরখানেক পর নিয়ে আসে। আমি যে বাড়িতে গিয়েছি, সেখানেই শুনেছি—মা এসেছিলেন, চলে গেছেন। আবার সামনের নভেম্বরে বা জুনে আসবেন। দেশকে ভুলে গেলেও বৃদ্ধ বাবা-মাকে এরা ভোলে নি।

কয়েকজন মার সঙ্গে দেখা হলো। জড় পদার্থের মতো মা। এক জায়গায় মূর্তির মতো বসে থাকেন। মুখভর্তি করে পান খান। পানের পিক কোথায় ফেলবেন তা নিয়ে খুব চিন্তিত বোধ করেন। একসময় বেসিন লাল করে পিক ফেলেন। সেই লাল বেসিনের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। ছেলে বা ছেলের বউ ছুটে এসে পানি ঢেলে বেসিন পরিষ্কার করেন।

এইসব মা'র কিছু করার নেই। যে সংসারে এসেছেন সেই সংসারের সঙ্গে তাদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। পুত্র এবং পুত্রবধূ দু'জনই কাজে চলে যায়। বাচ্চারা যায় স্কুলে। বিশাল বাড়িতে বৃদ্ধাকে একা একা বসে থাকতে হয়। বিকেলে বাচ্চারা ফেরে। দাদিমার সঙ্গে গল্প করতে তারা আগ্রহী হয় না, কারণ তারা বাংলা জানে না, দাদিমাও ইংরেজি জানেন না। কাজ শেষ করে ছেলের বউ ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে। ফিরে এসেই রান্না চড়ায়। তার সঙ্গেও কথা হয় না। উইকএন্ডে তারা বেড়াতে যায়। তিনিও সঙ্গে যান। শীতের সময় এই ষাট বছরের মহিলাকেও শার্ট-প্যান্ট পরতে হয়। তাঁর খুবই লজ্জা লাগে, কিন্তু কী আর করা!

এরকম একজন মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। কেন জানি শুরুতে তিনি খুব ভয়ে ভয়ে আমার কথার জবাব দিচ্ছিলেন। শেষে খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে অনেক কিছুই বললেন।

আমেরিকা আপনার কেমন লাগছে ?

ভালো লাগতাছে।

কী কী দেখেছেন ?

অনেক কিছু দেখলাম। নায়েগ্রা জলপ্রপাত। স্ট্যাচু অব লিবার্টি। আর কিছু দেখনের নাই।

এখন কী করেন ? ঘরে বসে থাকেন ?

হ।

সময় কাটে কীভাবে ?

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। বিষণ্ন চোখে তাকালেন। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর সময় কাটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

টিভি দেখেন না ?

এরার টিভি ভালো পাই না, নাটক হয় না ।

রান্নাবান্না করেন না ?

এরার চুলাও ভালো পাই না। আর কী রানমু ? নাতি-নাতনিরা ভাত-মাছ খায় না। এরা হট ডগ খায়, পিজা খায়।

ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন ?

হ।

দেশে কবে ফিরবেন ?

গত মাসে পাঠানোর কথা হইল। লোক পায় না বইল্যা পাঠাইতে পারে নাই। লোক পাইলে পাঠাইব।

আমেরিকা কি আপনি প্রথম এলেন, না আগে আরও এসেছেন ?

বাবা, আমি আগেও আসছি। এর আগে চাইরবার আসছি। এইটা নিয়ে পাঁচবার হইল।

আরও আসবেন ?

ইচ্ছা করে না বাবা। কিন্তু কী করব! ছেলে চায়।

ভদ্রমহিলার জন্য আমার খারাপই লাগল।

ছোট ভাই জাফর ইকবালের সঙ্গে এই ভদ্রমহিলার কষ্টের কথা বলছিলাম। শুনে সে হাসল। আমি বললাম, ভালোবাসা মাঝে-মাঝে খুব কষ্টকর হয়। ছেলের প্রবল ভালোবাসার কারণে এই বৃদ্ধা মা-কে কী কষ্টটাই না করতে হচ্ছে!

ইকবাল বলল, দাদাভাই, এই ভালোবাসায় ফাঁকি আছে। তোমরা যারা বাইরে থেকে আস তাদের পক্ষে এই ফাঁকি চট করে ধরা সম্ভব নয়। আমরা ফাঁকিটা জানি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ফাঁকি ?

শুভঙ্করের ফাঁকি।

সেটা কী ?

এরা যে প্রতি বছর বৃদ্ধা মা-কে টেনে আনছে তার কারণ মা'র প্রতি ভালোবাসা নয়। মা'র প্রতি যার ভালোবাসা থাকবে, সে মা-কে এই কষ্ট দেবে না। তারা মা-কে আনে, কারণ মা'র জন্য তারা গ্রীন কার্ড করিয়েছে। গ্রীন কার্ড যারা করে তাদের গ্রীন কার্ড বহাল রাখার জন্য কিছুদিন পরপর আমেরিকা আসতে হয়, নয়তো সিটিজেনশিপ পাওয়া যায় না। মা প্রথম সিটিজেন হবেন। তিনি সিটিজেন হওয়ার পর তাঁর অন্য ছেলেমেয়েদের স্পনসর করবেন ইমিগ্রেশনের জন্য—এই হলো চক্র। এই চক্র ভালোবাসার চক্র নয়, শুভঙ্করের ফাঁকির চক্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

কী আনন্দ! কী আনন্দ!!

মনে করা যাক, আপনাকে কেউ-একজন একটা পনের তলা উঁচু দালানে নিয়ে তুলল। আপনার পায়ের গোড়ালিতে দড়ি বাঁধল। সাধারণ দড়ি না, রাবারের দড়ি, টানলেই লম্বা হয়। তারপর পনের তলা উঁচু থেকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হলো। আপনি শাঁ শাঁ করে নিচে নামছেন। কলমা-কালাম যা জানা আছে সব পড়ে ফেলেছেন, একসময় পায়ের দড়িতে হ্যাঁচকা টান পড়ল, আপনার গতি বাধাপ্রাপ্ত হলো। রাবারের দড়ি লম্বা হচ্ছে, প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থায় আপনি থামলেন, চোখ মেলে দেখলেন এখনো বেঁচে আছেন। আপনার মনে গভীর আনন্দ হলো।

আপনি এই আনন্দ পেতে আগ্রহী? আমেরিকানরাও কিন্তু আগ্রহী। আমেরিকানদের প্রিয় পাস্টটাইমের মধ্যে সম্প্রতি এটি যুক্ত হয়েছে। এই খেলার নাম বাংগি জাম্পিং। ক্রমেই এই খেলা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বাংগি জাম্পিংয়ে বেশকিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। দড়ি যতটুকু লম্বা হওয়ার কথা, তারচেয়ে বেশি হয়েছে—মাথা মেঝেতে লেগে ফেটে চৌচির হয়েছে। বিপদের কারণে আমেরিকার সব স্টেটে এই খেলা খেলতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার জানা মতে, ছয়টি স্টেটে এই খেলার অনুমতি আছে। আগ্রহী আমেরিকানরা এই ছয় স্টেটে ভিড় করে।

উত্তেজনা ছাড়া বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। বাংগি জাম্পিংয়ে আছে উত্তেজনা। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য দরকার বাংগি জাম্পিং।

আটলান্টিক সিটিতে বাংগি জাম্পিংয়ের ব্যবস্থা আছে। এক-একবার ঝাঁপ দিতে ৫০ ডলার লাগে। ব্যাপারটা কী দেখতে গেলাম। দেখলাম দুই তরুণ-তরুণীর কোমরে দড়ি বাঁধা হচ্ছে (পায়ে বাঁধাই নিয়ম, নিরাপত্তার জন্য কোমরে)। দু'জনই বড় আনন্দিত। চোখ ঝলমল করছে। নিমিষে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। তারপর কপিকল দিয়ে দুজনকে টেনে তোলা হতে লাগল। ঝমঝম করে বাজনা বাজছে। বাংগি জাম্পের দুই তরুণ-তরুণী দর্শকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। ফ্লাইং কিস ছুড়ে দিচ্ছে। দর্শকেরাও হাততালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করছে। এরা উপরে উঠছে তো উঠছেই। একসময় বিন্দুর মতো ছোট হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর এরা ঝাঁপ দিল। বিদ্যুতের মতো নিচে নেমে আসছে। কী অকল্পনীয় গতি! আমি শুধু দেখছি, এতেই আমার গা ঘেমে গেল। যদি দড়ি ছিঁড়ে যায়? যদি দড়ি বেশি লম্বা হয়ে যায়, মাথা ঠেকে যায় মেঝেতে!

কোনো দুর্ঘটনা ঘটল না। তরুণ-তরুণীরা বাংগি জাম্পিং শেষ করে এল। তাদের লাল মুখ নীলচে হয়ে গেছে, কিন্তু মনে খুব ফুর্তি। প্রথম কথা যা বলল, তা হলো, গ্রেট ফান! প্রচণ্ড আনন্দ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আনন্দই তো জীবন। ফান চাই। ফান।

ফান না হলে বেঁচে থেকে লাভ কী ? এখন কথা হলো—একসময় তো বাংগি জাম্পিংও পুরনো হয়ে যাবে। তখন তারা ফানের জন্য কী করবে ? এরচেয়েও ভয়ংকর কিছু তাদের খুঁজে বের করতে হবে। কিছুদিন পর সেটিও পুরনো হবে, তখন আরও ভয়ংকরের খোঁজ করতে হবে। কী হবে সেই ভয়ংকর ?

এই আমেরিকারই এক মহান লেখক এডগার এলেন পো ভয়ংকর আনন্দের বর্ণনা দিয়ে একটি গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পে আনন্দের জন্য পশুর বদলে মানুষ শিকার করা হয়। একজন বন্দুক নিয়ে নামেন। আরেকজন নিরস্ত্র। গভীর জঙ্গলে বন্দুকধারী খুঁজে নিরস্ত্রকে। যে নিরস্ত্র সে পশু না, মানুষ, কাজেই তাঁর বুদ্ধি অনেক। সে বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে চায়। বন্দুকধারীর ওপর মরণ আঘাত করতে চায়। ভয়ংকর উত্তেজনার ভয়াবহ এক গল্প।

কে জানে, আমেরিকানরা হয়তো সেই ভয়ানক আনন্দের দিকেই যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

তলাবিহীন ঝুড়িতে বুনো ফুল

বাংলাদেশের এক ছেলে আমেরিকায় বিয়ে করেছে। সেই বিয়ের খবর এবং বর-কনের ছবি পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

বিস্মিত হওয়ার মতোই ঘটনা। বিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলেও পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ না। বাংলাদেশি ছেলে এই কাজটা কী করে করল ? নিজের বিয়েটা এত গুরুত্বপূর্ণ করল কীভাবে ? রহস্যটা কী ?

রহস্য হচ্ছে—বাংলাদেশের এই ছেলে কোনো মেয়েকে বিয়ে করে নি—বিয়ে করেছে আরেকটি ছেলেকে। ছেলে আমেরিকান।

আমেরিকায় এখন সমকামী বা 'গে'-রা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাদের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই তারা এখন জাঁকজমক করে বিয়ে করছে। সেই বিয়ের খবর পত্রিকায় ছাপছে।

বাংলাদেশি এই ছেলে ফ্রি সোসাইটির সুযোগ গ্রহণ করে বিয়ে করে ফেলেছে আমেরিকান ওই ছেলেকে। সে কি অন্যায় কিছু করেছে ? রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন, 'ন্যায় অন্যায় জানি না জানি না, শুধু তোমায় জানি।' কাজেই ছেলেটিকে দোষ দিয়ে কী হবে ? দেশে উদ্ভট কেউ কিছু করে বসলে তাকে মার দেওয়ার বিধান আছে। এতে একেবারে যে কাজ হয় না তাও না। কাজ হয় বলেই আমরা বলি—মারের উপর ওষুধ নেই। আমেরিকার মতো সুসভ্য (!) সমাজে মার দেওয়ার উপায় নেই। আমরা যা করতে পারি তা হচ্ছে এই নবদম্পতির জীবন যেন সুখময় হয় সেই প্রার্থনা। তাদের ঘরকন্না আনন্দময় হওয়ার কল্যাণ কামনা।

বাংলাদেশকে তো আমেরিকানরা কেউ চিনত না। এই ছেলের কারণে অনেকেই বাংলাদেশের নাম জেনেছে। সেটা ভেবেই আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। এছাড়া আমরা আর কী-ইবা করতে পারি!

এই ছেলের মতো বাংলাদেশি এক রূপবতী তরুণীও দেশকে পরিচিত করার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সে তার নগ্ন ছবি ছাপিয়ে যাচ্ছে পিনআপ পত্রিকায়। ছবির ক্যাপশন—

Flower from Bangladesh.

বাংলাদেশের পুষ্প। আফসোস এই, পুষ্পের সৌন্দর্য দর্শনে বাংলাদেশবাসী ব্যথিত হলো। সৌন্দর্য দেখছে আমেরিকানরা। দেখুক—সব সৌন্দর্য সবার জন্য নয়।

হেনরি কিসিঞ্জার একসময় তলাবিহীন ঝুড়ি বলে বাংলাদেশকে খুব অবজ্ঞা করেছিলেন। সেই অপমানের শোধ নিতে হবে। দেখাতে হবে তলাবিহীন ঝুড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ফুলও আছে। আমার খুব ইচ্ছা করেছিল মেয়েটিকে টেলিফোন করে বলি—খুকী! তোমার ছবি খুব সুন্দর আসে। তুমি যত ইচ্ছা ছবি ছাপাও। শুধু তুমি যে বাংলাদেশের সেটা চেপে যাও। এত সুন্দর মেয়ে আমাদের দেশে আছে—এটা বিদেশিদের আমরা জানাতে চাই না।

'Ten most wanted men' বলে FBI ভয়ংকর দশজন অপরাধীকে খুঁজছে। খুন এবং রেপ করে এরা ফেরার হয়েছে। কেউ কেউ একাধিক খুন করেছে। পোস্টার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দশজনের নাম প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের আহ্লাদিত হওয়ার কারণ ঘটেছে। দশজনের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমার মা'র আমেরিকা

বছর তিনেক আগে আমার মা আমেরিকা ভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর মেজো ছেলের কাছে চার মাস ছিলেন। এই চার মাসে পুরো আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেশে ফেরার পর আমরা তাঁকে ঘিরে ধরলাম। কী দেখলেন আমেরিকায় বলুন ? তিনি বিরস মুখে বললেন, তেমন কিছু দেখি নাই।

আমরা বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কী! নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখেছেন ?

হুঁ।

কেমন লাগল ?

আছে। মন্দ না।

বিশাল বিশাল দোকানপাট দেখেন নি ?

হুঁ।

কেমন ?

আছে। মন্দ না।

বিশাল আমেরিকা মা'কে তেমন অভিভূত করতে পারে নি। নেত্রকোনার কোনো গণ্ডগ্রামে বেড়াতে যাওয়ার পর ফিরে এসে তিনি যত গল্প করেন তার এক শ' ভাগের এক ভাগ গল্পও আমেরিকা নিয়ে করেন নি। কারণটা কী ? এবার আমেরিকা গিয়ে ছোটভাইকে জিজ্ঞেস করলাম। সেও বলল—মা নাকি চার মাস খুব নস্টালজিক ছিলেন। তাঁর মুখে শুধুই দেশের কথা। আমেরিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো—এ দেশে লোকজন নেই। শুধু বাড়িঘর আর গাড়ি। জনমানব নেই। চারদিক খাঁ খাঁ।

তাঁকে জনতার ভিড় দেখানোর জন্য নিউইয়র্কে নিয়ে দীর্ঘ সময় রাস্তায় হাঁটানোর পর আমার ভ্রাতৃবধূ ইয়াসমিন বলল, মা, এখন দেখেছেন কত মানুষ ?

মা শুকনো গলায় বললেন, কই, আমাদের দেশের মতো তো না। লোক তো এখানেও কম।

লোক বেশি থাকা কি ভালো ?

মা শান্ত গলায় বললেন, ভালো। মানুষ নেই দেশের দাম কী ?

চার মাসের জীবনে মা'র কীর্তিকলাপের একটা গল্প আপনাদের বলি। সেই দেশে খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো ছাড়া মা'র কিছুই করার নেই। বলতে গেলে বন্দি জীবন। ভাইয়ের ছেলেমেয়ে দু'টিকে প্রবল আগ্রহে বাংলা শেখাতে বসতেন। নিয়মিত স্বরে অ, স্বরে আ করেন। বাচ্চা দুটি খুব মজা পায়। গ্র্যান্ড মা'কে খুশি করার জন্য খানিকটা স্বরে অ, স্বরে আ করে তাদের ইংরেজি গল্পের বই পড়তে বসে কিংবা কম্পিউটারে ছবি আঁকতে শুরু করে। মার আর সময় কাটে না। বিকেলে একা একাই এদিক-ওদিক ঘুরতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

বের হন। আধ ঘণ্টাখানেক হেঁটে এসে প্রতিদিনই বলেন, বউ-মা, এতক্ষণ হাঁটলাম, জনমানুষ চোখে পড়ল না।

একদিন বাসায় ফিরে খুব খুশি। আনন্দিত গলায় বললেন, বউ-মা, আজ একটা কবরস্থান দেখে এলাম। আমেরিকানগুলোর অন্তর ভালো, এরা কবরস্থানগুলো এত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে ! কবরস্থান দেখে মনটা ভালো হয়ে গেছে। ঠিক করছি কাল আবার যাব।

বেশ তো মা, যাবেন। আপনার যেখানে ভালো লাগে যাবেন।

ওদের জন্য অজিফা পাঠ করে কিছু দোয়া-খায়েরও করব। এতে দোষ হবে না তো মা ?

দোষ হবে কেন ?

খ্রিষ্টান তো। এইজন্য বলছি।

খ্রিষ্টানদের জন্য দোয়া করলে কোনো দোষ হবে না। যিশুখ্রিষ্টকে আমরা নবী হিসেবে মানি। আপনি দোয়া করতে চাইলে করবেন।

এরপর থেকে মা প্রায়ই যান। অজিফা পাঠ করে দোয়া করেন। যে কবরস্থান মা'র এত পছন্দ সেই কবরস্থান আমার ছোটভাই একদিন দেখতে গেল। কবরস্থান দেখে তার চোখ কপালে উঠে গেল। নিউজার্সির হিউম্যান সোসাইটির কবরস্থান। সেখানে শুধু কুকুর ও বিড়ালের কবর দেওয়া হয়।

ব্যাপার শুনে মা খুবই অপমানিত বোধ করলেন। লজ্জা এবং দুঃখে রাতে ভালো খেলেন না। আমার ভাই বলল, মন খারাপ করার কী আছে ? এত মন খারাপ করছেন কেন ?

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, আমি কুকুর বিড়ালের জন্য অজিফা পাঠ করেছি ?

আপনার অজিফা পাঠের কারণে যদি তাদের একটা গতি হয় সেটা মন্দ কী ?

চুপ কর।

কাল আমার সঙ্গে চলুন, ওদের একটা আসল কবরস্থান দেখিয়ে আনব।

মা কঠিন গলায় বললেন, আসল নকল কোনো কিছুই আমি দেখব না। ফাজিল আমেরিকানদের কোনো কিছুই আমি দেখতে চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মালিন্ডা, ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিক

হোটেলের নাম আলাদিন।

বাঙ্গাল উচ্চারণে আলাউদ্দিন হোটেল। লাস ভেগাসের সবই হুলস্থুল—আলাদিন হোটেলও সে রকম। হোটেল তো না, ছোটখাটো উপনিবেশ। আলাদিনের পাশেই এম.জি এম গ্র্যান্ড। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হোটেল। রুমের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি...। থাকবই যখন এমন এক হোটেলে থাকা যাক, যাতে দেশে ফিরে বলতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেলে রাত কাটিয়েছি। টাকায় কুলাল না। সাধ ও সাধ্যের চিরন্তন সমস্যা।

হোটেল আলাদিনও মন্দ না। ঝকঝক তকতক করছে। ঘরে ঢুকলেই 'আহ্ কী সুন্দর' জাতীয় বাক্য আপনাতেই মুখে চলে আসে। কন্যারা খুব খুশি। তাদের আলাদা ঘর। বাবা মা-র চোখের সামনে থাকতে হবে না। দরজা বন্ধ করে মনের সাধ মিটিয়ে চিৎকার হইচই করতে পারবে। স্বাধীনতার আনন্দের মতো বড় আনন্দ আর কী হতে পারে?

বড় মেয়ে নোভা যথারীতি তাঁর ফিজিক্স বই নিয়ে বসে পড়েছে। নিরিবিলিতে সে নাকি খানিকক্ষণ পড়াশোনা করবে। আমি বললাম, না, লাস ভেগাসে কেউ ফিজিক্স পড়তে আসে না। সে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, লাস ভেগাসে কী করতে আসে?

আনন্দ করতে আসে। লাস ভেগাস হচ্ছে আনন্দ নগরী।

তোমরা আনন্দ করো। আমার আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে না।

বড় বোন যা করে ছোট দুই বোনও তা-ই করে। তারাও বিরস গলায় বলল, আমাদেরও আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে না।

তোমরাও কি ফিজিক্স পড়বে?

আমরা টিভি দেখব। ডিজনি চ্যানেল।

সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশা হলো চ্যানেল বিশেষজ্ঞ। সে মুহূর্তের মধ্যে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডিজনি চ্যানেল বের করে ফেলল। ডিজনি চ্যানেলে দেখাচ্ছে লিটল মারমেইড।

ওদের ঘরে রেখে আমি গুলতেকিনকে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। দুপুরে কোথায় খাব সেটা খুঁজে বের করতে হবে। হামবার্গারের হাত থেকে বাঁচা যায় কি না সেই চেষ্টা চালাতে হবে। হামবার্গার অসহ্য বোধ হচ্ছে। ভারতীয় রেস্টুরেন্ট পাওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই। চায়নিজ রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। জাপানি রেস্টুরেন্ট পেলে চলে। ওরাও ভাত খায়।

রাস্তায় নেমেই মনে হলো, আমি বড় ধরনের ভুল করেছি—মেয়েদের নিয়ে লাস ভেগাসে আসা ঠিক হয় নি। লাস ভেগাস আনন্দ নগরী, তবে এই আনন্দের জাত আলাদা। এই আনন্দ আদিম আনন্দ, নিষিদ্ধ আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

পথের দু'পাশেই অসংখ্য নিউজ স্ট্যান্ড। নিউজ স্ট্যান্ডে থরে থরে সাজানো সম্পূর্ণ নগ্ন নারী মূর্তির ছবির প্যাম্পলেট। চোখ পড়বেই। এক একবার আমার চোখ পড়ছে, আমি আঁতকে উঠছি।

একটু দূরে দূরে পিম্প জাতীয় নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা হাতে প্যাম্পলেট গুঁজে দিচ্ছে। প্যাম্পলেটের ভাষার একটি নমুনা দিই—

লাস্যময়ী পামেলা

আপনি আপনার হোটেলের কক্ষ নম্বর টেলিফোন করে জানালেই আমি সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় আপনার কক্ষে উপস্থিত হব। যদি আমাকে আপনার পছন্দ হয় তবেই আমি থাকব। এক রাত্রির জন্যে আপনাকে দিতে হবে মাত্র ১০০ ডলার। আপনার আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি আমার এক বান্ধবীকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে পারি। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে দিতে হবে মাত্র ১৫০ ডলার।

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, লাস ভেগাসে এই আনন্দ সম্পূর্ণ লিগ্যাল।

লাস্যময়ী পামেলা এবং পামেলার বান্ধবীর ভিন্ন ভিন্ন চারটি ছবি দেওয়া আছে। সেইসব ছবি হাতে ছুঁলেও কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হয় এমন অবস্থা। এটা অবশ্যি স্বীকার করতে হবে, মেয়েগুলো রূপবতী। অসম্ভব রূপবতী। শারীরিক সৌন্দর্য প্রকৃতির বড় উপহারের একটি—মেয়েগুলো এই মহান উপহারের কী কদর্য ব্যবহারই না করছে!

নিষিদ্ধ আনন্দের নগরী সারা পৃথিবীর ছেঁকে জোগাড় করেছে রূপবতীদের। মধ্যযুগের আনন্দকে বিংশ শতাব্দীর মোড়কে উপস্থিত করেছে। টপলেস বার আগেই ছিল। নগ্নবক্ষ দেখে দেখে লোকজন হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই এবার বটমলেস বার। বুকে কাপড় থাকবে, কিন্তু নাভীর নিচ থেকে কোনো কাপড় থাকবে না।

গুলতেকিন রাগী গলায় বলল, লাস ভেগাস আসার বুদ্ধি তোমাকে কে দিল?

আমি ভীত গলায় বললাম, কেউ দেয় নি। আমি নিজেই মাথা খেলিয়ে বের করেছি। অন্যের বুদ্ধির ওপর ভরসা করি নি।

কেন?

আমেরিকা জানতে হলে লাস ভেগাসে আসতে হবে।

আমেরিকা তোমাকে জানতে হবে কেন?

আমি লেখক মানুষ না?

লেখালেখির দোহাই দিবে না। বাচ্চারা রাস্তায় বের হয়ে যখন এইসব দৃশ্য দেখবে তখন তাদের কেমন লাগবে বলো তো!

খুবই খারাপ লাগবে।

আমার নিজেরই মাথা ঘুরছে। চলো হোটেল ফিরে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

দুপুরে কিছু খাব না ?

হোটেলে রুমসার্ভিসে যা পাওয়া যায় তা-ই খাব।

আমি বললাম, তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে, আমরা দুদিন দুরাত হোটেলে দরজা বন্ধ করে রুমে বসে থাকব ?

হ্যাঁ, আমি আমার মেয়েদের রাস্তায় নিয়ে শক থেরাপির ব্যবস্থা করব না। ওরা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছে—দুদিন বিশ্রাম করুক। শুনেছি, লাস ভেগাসে খুব ভালো ভালো শো হয়। বাচ্চাদের কোনো শো যদি থাকে সেখানে ওদের একবার নিয়ে যেয়ো।

তাহলে হোটেলেই ফিরে যাই।

অবশ্যই হোটেলে ফিরে যাব।

হোটেলে ফেরামাত্র বড় মেয়ে বলল, তার ফিজিক্স পড়তে একদম ভালো লাগছে না, সে রাস্তায় ছোটবোনকে নিয়ে বেড়াতে যাবে। আমাদের সঙ্গে নেবে না। আমরা শুধু উপদেশ দিই, আমাদের উপদেশ অসহ্য।

আমি মধুর গলায় বললাম, মা, তুমি ফিজিক্স পড়ো। সেটাই ভালো।

আনন্দ নগরীতে আমি ফিজিক্স পড়ব কেন ?

জ্ঞান সাধনাতেও আনন্দ আছে রে মা।

প্রথম রাতে হোটেলেই রইলাম, বের হলাম না। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর গুলতেকিনকে নিয়ে স্লট মেশিনে জুয়া খেলতে গেলাম। লাস ভেগাসে যাব, জুয়া খেলব না, তা তো হয় না। তা ছাড়া স্লট মেশিনগুলো অনেকটা শিশুদের খেলনার মতো। ঝনঝন শব্দ হয়, বাজনা বাজে। জুয়াটুয়া ঠিক জুয়া বলে মনে হয় না। এক ধরনের মজার খেলা বলে মনে হয়। তবে জুয়াখেলা বটেই।

আমরা ঠিক করলাম, সর্বমোট দু শ' ডলার হারব। এর বেশি এক সেন্টও নয়। আমি এক শ' ডলার, গুলতেকিন এক শ'। ভাগ্য ভালো থাকলে জিতেও তো যেতে পারি। অনেকেই জেতে। স্লট মেশিনে খেলে মিলিয়ন ডলার জেতার ঘটনা তো ঘটেছে।

গুলতেকিন প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল দু শ' ডলার হারার পর আর খেলা যাবে না, কিছুতেই না। গুলতেকিন বলল, আঠার বছরে তোমাকে চিনতে আমার বাকি নেই, অল্পতেই তোমার নেশা লেগে যায়। খেলা শুরু করলেই তোমার নেশা লাগবে—তুমি খেলতেই থাকবে। কাজেই তুমি তোমার সবচে প্রিয় জিনিসের নামে শপথ করো। আমি বললাম, বেশ যাও, জোছনার শপথ। এক শ' ডলারের বেশি খেলব না।

জোছনার শপথে খেলা শুরু করলাম। খেলাটা এ রকম—স্লট মেশিনের ফুটো দিয়ে একটা কোয়ার্টার ফেলে হাতল ধরে টানতে হয়। তিনটি চাকা ঘুরতে থাকে। চাকাগুলোতে নানান সংখ্যা লেখা ছবি আঁকা। যদি তিনটি চাকাতেই ৭ সংখ্যাটি উঠে আসে তবে খেলোয়াড় এক ধাক্কাতেই পেয়ে যাবে দশ হাজার ডলার। আমি যে মেশিনে খেলছি তাতে পাঁচ হাজার ডলার হলো লিমিট। জুয়া খেলা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা যায় না। মনের ভুলে বিসমিল্লাহ বলে ফেলে খুব আফসোস হতে লাগল। তারপরেও মনে হলো—দান লেগে যাবে। আমরা দু শ' ডলার খেলব, আট শ' বার খেলা হবে—আট শ' বারে কি একবারও দান উঠবে না ? স্ট্যাটিসটিকস কী বলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

প্রথম হাতল টানতেই মেশিনের বাতি জ্বলে উঠল। নানান বাদ্য-বাজনা বাজতে থাকাল, ঝনঝন শব্দে কোয়ার্টার বেরুতে লাগল। তিনটা ৭ উঠে নি, তবে তিনটি চেরীফুল উঠেছে। তিনটা চেরীফুলের জন্য আমি পাচ্ছি চার শ' কোয়ার্টার অর্থাৎ এক শ' ডলার। ঝনঝন শব্দে কোয়ার্টার পড়ছে। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে আমার দিকে। প্রায় নগ্ন হোটেল পরিচারিকা হাসিমুখে ট্রে হাতে উপস্থিত হলো। ট্রেতে নিষিদ্ধ পানীয়। জুয়াড়িদের হোটেলের খরচে মদ্যপান করানো হয়। আমার কিছু বলার আগেই গুলতেকিন বলল, ও এসব খায় না। থ্যাঙ্ক ইউ।

পরপর দু'বার জেতা নিতান্তই অসম্ভব। সেই অসম্ভবও সম্ভব হলো। পরের দানেও আমি এক শ' ডলার জিতে নিলাম। এখন যদি আমি খেলা বন্ধ করে উঠে যাই তাহলে দু শ' ডলার জেতা থাকে। এই দু শ' ডলারে কত কি কেনা যায়? মাইক্রোওয়েভ ওভেন খুব সস্তা—দেড়শ ডলার। দেশে এর দাম কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা। আমার একটা ভালো দূরবীনের খুব শখ। আমার যেটা আছে তা দিয়ে শনি গ্রহের বলয় দেখা যায় না। দু শ' ডলারে শনিগ্রহের বলায় দেখার মতো দূরবীন হতে পারে।

আচ্ছা ব্যাপারটা কী—একের পর এক দান পড়ছে। মনের ভুলে বিসমিল্লাহ বলায় কি আমার কপাল খুলে গেল? কোয়ার্টার রাখার জায়গা নেই। অথচ কুড়ি ডলারও খেলা হয় নি।

গুলতেকিন বলল, তুমি আমার একটা কথা শুনবে? অনেক জিতেছ, এখন খেলা বন্ধ করো। চলো কোয়ার্টার ভাঙিয়ে ডলার করে ফেলি। দেশে ফিরে বলতে পারব, আমরা লাস ভেগাস থেকে জিতে ফিরেছি। কেউ তো ফেরে না।

আমি বললাম, চুপ করো।

তোমার চোখ-মুখ যেন কেমন হয়ে গেছে। তোমার নেশা ধরে গেছে। প্লিজ চলো।

চুপ করো।

ধমকাচ্ছ কেন?

ধমকাচ্ছি না, চুপ করতে বলছি।

গুলতেকিন চুপ করে গেল। আমি খেলতেই থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে জেতা টাকা চলে গেল। তারপর গেল মূলধন। জোছনার নামে শপথ করেছিলাম—দু শ' ডলারের বেশি খেলা হবে না। হঠাৎ মনে হলো, শপথে কি যায় আসে? জোছনা একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। আমার শপথে তার কিছু যাবে আসবে না। আমি হারি বা জিতি প্রতি পূর্ণিমায় আকাশ ভেঙে জোছনা আসবে।

আমার মনের একটি অংশ ফিসফিস করে বলল, জুয়া খেলে এত টাকা নষ্ট করা কি ঠিক হবে?

মনের অন্য অংশটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, আহা তুমি তো আর রোজ রোজ খেলছ না। লাস ভেগাসে তো প্রতিদিন আসা যায় না। একবারই এসেছ। আবার কবে আসবে কে জানে! খেলে যাও।

মনের সু অংশ বলল, তোমার স্ত্রী কিন্তু রাগ করছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মনের কু অংশ বিরক্ত গলায় বলল, করুক রাগ। তুমি তো আর তার টাকায় খেলছ না। তুমি খেলছ তোমার নিজের টাকায়। তার এত রাগ করার কী আছে? তুমি তোমার স্ত্রীর কঠিন দৃষ্টি উপেক্ষা করে খেলে যাও।

আমি খেলে গেলাম। রাত তিনটার দিকে মানিব্যাগের সব ডলার (প্রায় চার শ') শেষ হয়ে গেল। আর যে খেলব, সে উপায় নেই। ডলার শেষ। গুলতেকিনের ট্রাভেলার্স চেক আছে। সে সেই চেক ভাঙিয়ে আমাকে ডলার দেবে—এ দুরাশা না করাই ভালো। আমি স্লট মেশিন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। গুলতেকিনের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললাম, চলো যাওয়া যাক।

গুলতেকিন বলল, এতগুলো টাকা হেরে তোমার খারাপ লাগছে না?

আমি বললাম, না। খেলতে গিয়ে যে তীব্র উত্তেজনা বোধ করেছি তার দাম হাজার ডলারের মতো। আমি হেরেছি মাত্র চার শ' ডলার।

তোমার রক্তের মধ্যে আছে জুয়া, তা কি তুমি জানো?

খুব ভালো করে জানি। পৃথিবীর সব সৃষ্টিশীল মানুষদের থাকে জুয়ার প্রতি আসক্তি। আমি নিজেকে সৃষ্টিশীল মানুষ মনে করি। মনের সাধ মিটিয়ে খেলতে পারলাম না এই আফসোস।

সাধ মেটে নি?

না।

গুলতেকিন আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বলল, আমি তোমাকে ডলার ভাঙিয়ে দিচ্ছি—যাও খেলে আসো। আফসোস থাকাটা ঠিক না। বুকে তৃষ্ণা নিয়ে ঘুমাতে যাবে কেন? যাও তৃষ্ণা মেটাও।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ।

আমি আরও এক শ' ডলার ভাঙিয়ে স্লট মেশিনের কাছে ছুটে গেলাম—তখন মনে হলো—আরে, আমি এ কী করছি। মানুষের সব তৃষ্ণা মেটার নয় জেনেও তৃষ্ণা মেটাতে ছুটে যাচ্ছি? আমি না খেলেই উঠে এলাম। ঝনঝন শব্দে স্লট মেশিনটা আমকে ডাকতে লাগল—এই আয় না, আয়। যাচ্ছিস কোথায়? বোকা ছেলে। নাইট ইজ স্টিল ইয়াং।

পরের দিন রাতের কথা। স্লট মেশিনের ধারে কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বাচ্চাদের নিয়ে সময় কাটানোর পরিকল্পনায় বসলাম।

বাচ্চাদের দেখানো যায় এমন একটা শো খুঁজে পাওয়া গেল। মালিন্ডা ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিক। এই তরুণী গত আট বছর ধরে লাস ভেগাসে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। প্রতি রাতে দুটা শো করেন। রাত আটটায় একটা, সেখানে বাচ্চারা যেতে পারে। রাত দশটায় একটা, সেখানে ১৮ বছরের নিচের কেউ যেতে পারে না। ম্যাজিকের মতো ব্যাপারে এমন কী থাকতে পারে যে আঠার বছরের নিচের কেউ যেতে পারে না তা আমার মাথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ঢুকল না। বাচ্চাদের জন্য টিকিট কাটলাম। তিরিশ ডলার করে টিকিট। বাংলাদেশি টাকায় প্রতি টিকিটের দাম বার শ' টাকা। মনটা একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল। এত টাকা খরচ করে যাচ্ছি, যদি ম্যাজিক শো মনমতো না হয়? আমরা ম্যাজিকের দেশের মানুষ। অসাধারণ সব ম্যাজিক দেখে আমরা অভ্যস্ত।

রাত আটটায় শো শুরু হলো। হল অন্ধকার। অপূর্ব বাজনা বাজছে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ক্ষীণ আলোর ইশারা দেখা গেল। অপূর্ব বাজনা। আলো ও আঁধারে শূন্য থেকে আবির্ভূত হলেন ম্যাজিকের ফার্স্ট লেডি জাদুরানী মালিন্ডা।

মালিন্ডাকে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কারণ তিনি প্রায় নগ্ন হয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। নারীদেহের যেসব অংশ দর্শনীয় বলে বিবেচনা করা হয় তার সবই দেখা যাচ্ছে। একটা সাধারণ রুমালে যতটুকু কাপড় থাকে ততটুকু কাপড়ও এই ফার্স্ট লেডি অব ম্যাজিকের গায়ে নেই। গুলতেকিন আঁতকে উঠে বলল, তুমি না বললে এটা বাচ্চাদের শো!

আমি ঢোক গিলে বললাম, টিকিটে তো তা-ই লেখা।

আমার তিন কন্যার দুই কন্যা হাঁ করে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। তৃতীয় জনের লজ্জা একটু বেশি। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

জাদুকন্যার সাথীরা আবির্ভূত হলেন। মাশাআল্লাহ তাঁরা আরও এক ডিগ্রি উপরে। সূর্যের চেয়ে বালি গরম। বড় বড় ফুটার মাছধরা জাল জাতীয় এক ধরনের কাপড়ে তাঁরা শরীরের লজ্জা (যদি কিছু থেকে থাকে) নিবারণ করছেন। শুরু হলো নাচ। কিছুক্ষণ নাচ চলে—নাচের ফাঁকে ম্যাজিক, আবার নাচ।

ম্যাজিকগুলো কেমন?

ভালো। শুধু ভালো না, বেশ ভালো। তবে সমস্যা হচ্ছে ম্যাজিকের দিকে কারোর চোখ থাকে না—চোখ পড়ে থাকে মালিন্ডার দুগ্ধফেননিভ নগ্ন শরীরে।

শোর মাঝখানে একজন জাগলার এসে জাগলিং করলেন। তিনি পৃথিবীর সেরা জাগলার—গিনিস বুক অব রেকর্ডে তাঁর নাম আছে। জাগলিং দেখে আমরা হতভম্ব হলাম। আমার তিন কন্যা হাততালি দিতে দিতে হাত লাল করে ফেলল। একপর্যায়ে চীনদেশীয় দুই ভাই এসে ছুরি চাকু দিয়ে কিছু খেলা দেখিয়ে সবার চুল খাড়া করে দিল। তিন কন্যার হাততালি আর থামেই না। শুধু যখন মালিন্ডা ম্যাজিক দেখাতে আসে, তখন আমার কন্যারা ঝিম মেরে যায়। ঝিম মেরে যাওয়ারই কথা।

জাদু দেখে হোটেলে ফিরছি—আমি বললাম, মায়েরা, ম্যাজিক কেমন দেখলে?

কেউ জবাব দিল না।

আমি বললাম, মেয়েটি কী পোশাক পরে ম্যাজিক দেখিয়েছেন সেটা বড় কথা না। ম্যাজিক কেমন দেখিয়েছেন সেটা বড় কথা। আমরা তাঁর সৃষ্টিকে দেখব। তাঁকে দেখব না। এখন বলো, ম্যাজিক কেমন দেখলে?

তিনজনই একসঙ্গে বলল, অসাধারণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমরা একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি, হুয়ালপাই ট্রাইব ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের প্রধান এবং ভ্যালেন ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি যৌথভাবে এই সার্টিফিকেট দিয়েছে। সেখানে লেখা—

OFFICIAL
GRAND CANYON EXPLORER AWARD

Be it show by this certificate that
The HUMAYUN AHMED FAMILY
has succesfully braved the Great Mojave Desert
and travelled the gruelling 45 mile Great Hualapai
Indian Reservation wilderness road... to physically
walk, without guard nor parachut, the mile high rim
of the Great American Grand Canyon thereby
earning the right to be called American Explorer and
Adventurer on this 14th day of September 1994.

বঙ্গানুবাদ হলো—

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অভিযাত্রী সম্মান

এই সার্টিফিকেটের দ্বারা প্রত্যয়ন করা হচ্ছে যে
হুমায়ূন আহমেদ পরিবার
সাফল্যজনকভাবে অসীম সাহসিকতায় মহা মোজাবি মরুভূমি
অতিক্রম করে হুয়ালপাই ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনের ভেতর দিয়ে
দীর্ঘ ভয়াবহ পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের
এক মাইল গভীর খাদ পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা যেখান দিয়ে
হেঁটেছেন সেখানে কোনো রেলিং ছিল না, তাঁরা সাবধানতার
জন্যে কোনো প্যারাসুটও পরেন নি। তাঁরা এই অসীম
সাহসিকতা দেখানোয় যুক্তিসঙ্গতভাবেই তাঁদেরকে এখন
আমেরিকান অ্যাডভেঞ্চারার বলা যায়...।

আমাদের এই সার্টিফিকেট অর্জনের শানে নূজুল এখন বলা যাক।

ভ্যান এলেন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অতিথি হয়ে এক ভোরবেলায় লাস ভেগাস রওনা হলাম গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখতে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

প্রাকৃতিক আশ্চর্যের প্রধান আশ্চর্য। আমাদের ভূগোল বইতে আমরা ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কথা পাই, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কথা পাই, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কথা পাই না। কাজেই এই অসাধারণ প্রাকৃতিক বিস্ময় সম্পর্কে আমরা মোটামুটি অজ্ঞই বলা চলে। আমি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সম্পর্কে প্রথম পড়ি আমেরিকান নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখক জন স্টেইনবেকের রচনায়। এই লেখক একসময় পায়ে হেঁটে পুরো আমেরিকা ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা করেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের পাশে এসে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে লেখেন—যে-কোনো নাস্তিক এই জায়গায় এসে দাঁড়ালে আস্তিক হতে বাধ্য।

আগেও একবার লাস ভেগাসে আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। পিএইচডি ছাত্র হিসেবে লাস ভেগাসে একটা কনভেনশনে এসেছিলাম। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন লাস ভেগাস থেকে মাত্র দেড় শ' মাইল। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তখন দেখা হয় নি, কারণ মহা বিস্ময়কর কোনো কিছু আমার একা দেখতে ভালো লাগে না। প্রিয়জনদের নিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কোনো একটা কিছু দেখে প্রিয়জনের বিস্ময়ে অভিভূত হওয়ার দৃশ্য দেখে আমি অনেক মূল্যবান দৃশ্য দেখার চেয়েও বেশি আনন্দ পাই। তখন এমন একটা ভাব মনের ভেতর হয় যেন এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি আমিই তৈরি করেছি। সেবার গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন যাওয়া প্রায় ঠিক হয়েছিল—হঠাৎ মনে হলো বেচারি হুমায়ূন একা একা ফার্গো শহরে পড়ে থাকবে আর আমি মহানন্দে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখব—এটা ঠিক না। যাওয়া বাতিল হলো। এবার সে সমস্যা নেই, এবারে আমি সঙ্গে-বাচ্চা নিয়ে প্রস্তুত...।

বাস ছাড়ল ভোরবেলা। শহর ছাড়িয়ে মরুভূমি। মরুভূমির ক্লান্তিকর দৃশ্য বাসের জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল। কয়েকবারই মনে হলো—আমাদের কী সৌভাগ্য, প্রকৃতি সারা পৃথিবীকে মরুভূমি বানান নি। তিনি ইচ্ছা করলেই তো সারা পৃথিবী মরুভূমি বানিয়ে পাঠাতে পারতেন। সেই মরুভূমিতে মানুষ সৃষ্টি না করে বিচিত্র কোনো পোকা বানিয়ে আমাদের পাঠাতে পারতেন। মরুভূমির আগুনগরম বালিতে আমরা দশ পায়ে হেঁটে বেড়াতাম আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম একফোঁটা বৃষ্টির জন্য...।

বাস এবার উঁচুতে উঠছে। দুদিকে পাথরের পাহাড়। ঘাসপালা, গাছ কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। যেন আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর জীবন-বর্জিত অংশে। এখানে শুধুই পাথর—কঠিন গ্রানাইট। আমাদের গাইড এখন মাইক হাতে তুলে নিলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক। গাইডরা সাধারণত রেকর্ড বাজানোর মতো করে মুখস্থ কথা বলে। যা ভয়াবহ ধরনের ক্লান্তিকর হয়ে থাকে। এই ভদ্রলোক কথা বলছেন সুন্দর করে। তাঁর কথা শুনেই মনে হচ্ছে—ভদ্রলোকের জীবন থেকে বিস্ময় পুরোপুরি দূর হয় নি। ভদ্রলোক বলছেন,

> ডিয়ার ফ্রেন্ডস, প্রিয় বন্ধুরা, আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে এখন বিকল্প রাস্তায় নেমে যাব। রাস্তাটা সরু, মাঝে মাঝে ভাঙা, প্রচুর আপস অ্যান্ড ডাউন্স আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের রোলার কোস্টারে চড়ার অভিজ্ঞতা হবে। বিকল্প পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

কারণ আপনাদের একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখানো হবে। ছোট্ট একটা বন। অরণ্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

এই অরণ্যে সব এক ধরনের গাছ। সংখ্যায় খুব যে বেশি তা না। তারপরেও এই অরণ্য অসাধারণ অরণ্য, কারণ এই অরণ্য সম্ভবত আপনারা আগে দেখেন নি। বিশ্বের এই একটি জায়গাতেই এই অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। আর কোথাও নেই। গ্রান্ড ক্যানিয়নে দ্বিতীয়বার এসেও যে এই অরণ্য দেখবেন সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের কাছে আসতে হলে যে কষ্ট করতেই হয়, সেই কষ্ট করতে কেউ সহজে রাজি হয় না।

যাই হোক, অরণ্য সম্পর্কে বলি। যে গাছে এই অরণ্য সেই গাছের নাম যশোহা বৃক্ষ। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের দৈত্যাকৃতি ক্যাকটাস। এর বেশি আপনাদের কিছু বলব না, শুধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিব যে, যশোহা বৃক্ষে হাত দেবেন না। ভয়ংকর কাঁটা। শুধু ছবি তুলবেন, স্যুভেনিয়ার হিসেবে কেউ যেন ভুলেও গাছের অংশবিশেষ কেটে না নেন। গাছগুলো সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই গাছের কোনো ক্ষতি করলে বা করার চেষ্টা করা হলে এক হাজার ডলার জরিমানার বিধান রয়েছে।

ক্যামেরা রেডি করে রাখুন—আমরা চলে এসেছি। প্রাণ ভরে দেখুন যশোহা বৃক্ষ। আপনাদের দশ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

আমরা পঞ্চাশজন ট্যুরিস্ট—নেমে এলাম। অন্যদের কথা বলতে পারি না, আমি গেলাম হকচকিয়ে—এ কী! কী দেখছি চারপাশে? এই বৃক্ষরাজি তো পৃথিবীর হতে পারে না—নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রহের। ট্যুরিস্টরা পাগলের মতো ছবি তুলছে। জাপানিরা এমনিতেই স্বল্পভাষী—এদের কথা বলতে শোনাই যায় না—এরা এখন সমানে ক্যাচ ক্যাচ করে যাচ্ছে। এক জাপানি তরুণীর শখ হলো যে গাছে হাত দিয়ে ছবি তুলবে। তার স্বামী ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে হাত বাড়াচ্ছে—হাত দিয়ে গাছ স্পর্শ করতেও তার ভয় লাগছে, আবার স্পর্শ করার লোভও সামলাতে পারছে না।

গাছগুলো কেমন? দৈত্যাকৃতি ক্যাকটাস গাছ। আবার ঠিক ক্যাকটাসও নয়—কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এদেরকে লোমশ প্রাণীর মতো মনে হয়। যেন একদল লোমশ প্রাণী ওঁৎ পেতে বসে আছে, এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে।

আমি গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম, যশোহা বৃক্ষে ফুল ফোটে?

হ্যাঁ, ফোটে।

সেই ফুলগুলো কেমন?

গাছ যেমন অদ্ভুত, ফুলও অদ্ভুত। হলুদ রঙের ফুল, তীব্র ধরনের ফুল (sharp flower)। গাড়িতে ওঠো। গাড়িতে ওঠো। দশ মিনিট পার হয়েছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখনো অনেক দূর যেতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমার নড়তে ইচ্ছা করছিল না। ভাবলাম গাইডকে বলি, তুমি আমাকে এখানে রেখে যাও, আমি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যশোহা বৃক্ষের অরণ্যে ঘুরব। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিয়ে যেয়ো..।

বলা হলো না। গাড়িতে উঠলাম, মন পড়ে রইল যশোহা বৃক্ষের নিচে। মন ফেলে এসেছিলাম বলেই কি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আমার মনে ধরল না?

না, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আমার ভালো লাগে নি। সম্ভবত পর পর দুবার বিস্মিত হওয়া যায় না বলেই গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখে বিস্ময় বোধ হলো না—অথচ সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসছে প্রকৃতির এই আশ্চর্য খেলা দেখতে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন একমাত্র জায়গা যেখানে প্লেন টেকঅফ করে আকাশে না গিয়ে নিচে নেমে যায়। মানুষ প্যারাসুট করে ক্যানিয়নে ঝাঁপ দেয়।

গাধা এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে ট্যুরিস্টের দল গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে নামে। নামতে লাগে পুরো দুদিন, উঠতে লাগে তিন থেকে চার দিন। পুরো এক মাইল নামা, আবার এক মাইল উঠা তো সহজ কথা নয়। এখানে রঙের খেলাও আছে—গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সকালে এক রঙ, দুপুরে অন্য, বিকেলে আরও ভিন্ন এক রঙ...।

তারপরেও আমার মন লাগল না—বারবার মনে হতে লাগল যশোহা বৃক্ষের কাছে না থেকে কোথায় এসেছি! ফেরার পথে পাঁচ ডলার দিয়ে যশোহা বৃক্ষের বীজ কিনলাম।

আমাদের গাইড বলল, তুমি করেছ কী? পাঁচ ডলার খামাখা নষ্ট করলে? এই গাছের বীজ থেকে কখনো গাছ হয় না। বিশাল মোজাবি ডেজার্টের একটা ক্ষুদ্র অংশেই শুধু এই গাছ হয়। তুমি বীজ ফেরত দিয়ে ডলার নিয়ে এসো। ডলার নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

আমি ডলার ফেরত নিলাম না। পৃথিবীর সবকিছুই তো নষ্ট হয়ে যায়, ডলার নষ্ট হবে তা এমন বেশি কি। থাকুক না আমার পকেটে ঘুমন্ত কিছু যশোহা বৃক্ষ।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আবার যশোহা বৃক্ষ দেখা যাবে এই আশায় আমি জানালার পাশে বসে আছি। বাস খুব দুলছে, দুলুনিতে ঘুম এসে যাচ্ছে। প্রাণপণে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল যশোহা অরণ্য। দ্বিতীয়বার দেখা হলো না। সেই ভালো—অলৌকিক সৌন্দর্য দ্বিতীয়বার দেখতে নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ধাঁধা

গত নব্বইয়ের অক্টোবরে আমেরিকায় একটা ঘটনা ঘটল। যে ঘটনায় পৃথিবীর মানুষ নিদারুণ আতঙ্কে নড়ে উঠল। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে ঘটনাটির বিবরণ ছাপা হলো। আমি আমার দেশের সংবাদপত্রে ঘটনাটি প্রথম পড়ি। পরে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়ি সাপ্তাহিক *টাইম* পত্রিকায়।

ঘটনাটা এ রকম—হ্যালোইনের রাত। আমেরিকান শিশুরা ভূতের মুখোশ পরে হইচই করছে, আনন্দ করছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, ট্রিট অর ট্রিক। চকলেট দাও, নয় তো ভয় দেখাব...। এইসময় ঘর ছেড়ে বের হলো জাপানি এক তরুণ। আমেরিকা নামক স্বপ্নের দেশে সে বেড়াতে এসেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে স্বপ্নের আমেরিকা। যা দেখছে তা-ই তার ভালো লাগছে। হ্যালোইন দেখেও সে খুব মজা পাচ্ছে—বাহ্ কী সুন্দর ভূত উৎসব!

আমেরিকান এক বাড়িতে রাতে তার খাওয়ার নিমন্ত্রণ। সে ঠিকমতোই এসেছে, তবে কোন বাড়ি সে ধরতে পারছে না। সব বাড়ি তার কাছে একরকম লাগছে। সে ভুলে অন্য এক বাড়িতে উপস্থিত হলো। বেল টিপল। গৃহকর্তা পিপহোল দিয়ে দেখলেন অচেনা একটি ছেলে। তিনি ইংরেজিতে বললেন, তুমি কে? কী চাও? জাপানি ছেলে ইংরেজি জানে না। সে চুপ করে রইল। গৃহকর্তা বললেন, তোমাকে আমি চিনি না। তুমি আমার বাড়ির সীমানায় ট্রেসপাস করেছ। চলে যাও।

যুবকটি চুপ করে আছে। সে কথাবার্তা কিছুই বলছে না।

গৃহকর্তা তখন শটগান হাতে নিলেন—জানালা দিয়ে ছেলেটিকে তাক করে গুলি করে মেরে ফেলে পুলিশে খবর দিলেন।

আমেরিকান আইনে গৃহকর্তার কোনো সাজা হলো না। কারণ তার অধিকার আছে নিজেকে রক্ষার। ছেলেটি তার বাড়ির সীমানায় ট্রেসপাস করেছে। চলে যেতে বলার পরেও যায় নি। দাঁড়িয়ে ছিল।

ছেলেটির ডেডবডি দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাপান থেকে এল ছেলের বাবা মা। মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার ছেলে ঠিকানা ভুল করে অন্য এক বাড়িতে উঠেছে বলে তাকে মেরে ফেলতে হবে? তোমরা কেমন মানুষ?

তারা পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য (!) দেশের মানুষ। তারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সুসভ্য মানুষদের কাছে যাওয়ার জন্য, তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। তাদের বুকের রক্ত স্পন্দিত হয়ে বাজছে—আমেরিকা! আমেরিকা! আমেরিকা! ভিসার জন্য রাত তিনটা থেকে অ্যাম্বেসির সামনে লাইন পড়ে। লোকজন বাড়ির দলিল, গাড়ির ব্লু বুক কোলে নিয়ে বসে থাকেন—যাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ভিসা অফিসারকে বলতে পারেন, আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। আমি তোমাদের দেশে থাকব না, চলে আসব। শুধু একবার তোমাদের দেশে আমাকে যেতে দাও। প্লিজ প্লিজ, দয়া করো।

পাদটীকা

প্লেনে ঢোকার আগে যাত্রীদের খুব ভালো করে চেক করা হয়। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না দেখা হয়। যাত্রীদের মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এ জাতীয় মেটাল ডিটেকটর এখন আমেরিকান স্কুলগুলোতে বসানো হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এখন মেটাল ডিটেকটরের ভেতর দিয়ে স্কুলে যেতে হয়। কেন? এটা একটা ধাঁধা, জবাব আপনারা খুঁজে বের করুন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

হে বন্ধু, বিদায়

আমি খুব বন্ধুবৎসল নই।

দীর্ঘদিন কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। সম্ভবত আমিও পারি না। তবে পুরোনো পরিচিতরা হঠাৎ উপস্থিত হলে খুব ভালো লাগে। ফেলে আসা দিনের গল্প করতে ভালো লাগে। অকারণে হো হো করে হাসতে ভালো লাগে। এই সৌভাগ্য আমার কমই হয়। পরিচিতরা আমাকে এড়িয়ে চলেন।

আমেরিকায় ভিন্ন ব্যাপার হলো। কলেজ-জীবনের বন্ধুরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা একের পর এক টেলিফোন করতে লাগল। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। সবার একই কথা—গাড়ি নিয়ে আসছি, তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাব। আমেরিকায় কোথায় কোথায় ঘুরতে চাও সেই ব্যবস্থা করব।

আমেরিকাপ্রবাসী আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে বিত্তবান। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করছে, কেউ বড় বড় কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে। পড়াশোনায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি পিএইচডি সবারই আছে। সায়েন্টিফিক জার্নাল খুললেই তাদের নাম পাওয়া যায়। তারা সর্ব অর্থে সফল মানুষ।

এমনই একজন ড. আবদুল মজিদ। আমরা একসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.Sc. করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিয়োলজি বিভাগে যোগ দেই, সে যোগ দেয় ফার্মেসি বিভাগে। দুজন একসঙ্গে পিএইচডি করতে যাই। আমি পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরে আসি। সে থেকে যায় এবং একের পর এক সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। বিশাল বাড়ি কিনে ফলাও কারবার করে ফেলে।

আমেরিকা গিয়ে মজিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। সেও অন্যদের মতো বলল, আমি গাড়ি নিয়ে আসছি। থাকি অবশ্যি সাত শ' মাইল দূরে। আমেরিকায় এই দূরত্ব কিছুই না। তুমি হ্যাঁ বলো, আমি চলে আসছি।

আমি বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। টেলিফোনে জমিয়ে গল্প করছি। একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম—চাকরিতে কি আরও উন্নতি করেছ? নতুন কোনো পালক কি যুক্ত হয়েছে?

মজিদ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি শোনো নি? আমার চাকরি নেই।

চাকরি নেই মানে?

নেই মানে নেই। কোম্পানি বেশকিছু লোক ছাঁটাই করেছে—আমি তার মধ্যে পড়ে গেছি।

সে কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমেরিকায় এরকম তো অহরহই ঘটছে। নতুন কিছু তো না। একসময় আমাকে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। আগ্রহ করে রেখেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে, বিদায় করে দিয়েছে।

এখন কী করবে?

নতুন চাকরি খুঁজব। তুমি এত হকচকিয়ে গেছ কেন?

মজি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছে, আমি আর স্বাভাবিক হতে পারছি না। এই বয়সে একজন নতুন চাকরি খোঁজে—ভাবতেই কেমন লাগে।

মজিদ, চাকরি পাবে তো?

পাব। অবশ্যই পাব।

যদি না পাও?

একটা-কিছু হবেই, এখন বলো, দেশের খবর বলো..।

আলাপ আর জমল না। আমি বিষণ্ন হয়েই টেলিফোন রাখলাম। অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে একজন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কী করে টেলিফোন করছে তা-ই আমার মাথায় আসছে না। এই অনিশ্চয়তায় আমেরিকানরা অভ্যস্ত। আমরা অভ্যস্ত নই। অভাবের দেশের মানুষ বলেই আমরা চাকরির অনিশ্চয়তায় অস্থির বোধ করি।

একজন খুব বড় চাকুরে ভোরবেলা অফিসে গিয়ে শুনবে তার চাকরি নেই, এরকম আমাদের দেশে সাধারণত ঘটে না। আমাদের দেশে চাকরি পাওয়া যেমন জটিল, চাকরি খোয়ানো তারচেয়েও জটিল। তা-ই সব অপরাধের পরেও আমাদের দেশে চাকরি যায় না। যিনি চাকরি নট করবেন তিনি অপরাধীর সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কথা চিন্তা করেন। চাকরি চলে গেলে ওরা খাবে কী—এই ভেবে বলেন, থাক। পরের বার যদি আবার অপরাধ করে তখন দেখা যাবে। লোকটি আবারও অপরাধ করে। তখন বলা হয়, আচ্ছা আরেকটা চান্স দিয়ে দেখি। চান্সে লাভ হয় না। যার শাস্তির ভয় নেই সে তো অপরাধ করবেই। তখন বলা হয়—এটাই সর্বশেষ সুযোগ। আর না। যথেষ্ট হয়েছে...।

বলাই বাহুল্য, সর্বশেষ সুযোগ হারাবার পরেও চাকরি থাকে।

আমেরিকায় এই ব্যাপার নেই। সারভাইভাল ফর দি ফিটেস্ট। তুমি যদি ফিট হও সারভাইভ করবে। আনফিট হলে গো অ্যাওয়ে। দখিন দুয়ার খোলা।

ধরা যাক, একজন আমেরিকান খুব ভালো চাকরি করছে। বছরে আশি নব্বই হাজার ডলার পাচ্ছে। হঠাৎ তার চাকরি চলে গেল। পরবর্তী ঘটনাগুলো কী ঘটে তার সিনারিও তৈরি করা থাকে।

প্রথম চার মাস তার কোনো সমস্যা নেই। চাকরি যাওয়া না-যাওয়া নিয়ে সে ইন্স্যুরেন্স করে রেখেছিল। সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চার মাস (ক্ষেত্রবিশেষে ছয় মাস) তাকে আগে যে বেতন পেত সেই বেতন দেবে। এই চার মাসে সে যদি চাকরি জোগাড় করতে পারে তাহলে ভালো কথা, যদি না পারে তখন কী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

(ক) প্রথমে চলে যাবে তাঁর সুরম্য গাড়ি। এই বাড়ি তার কেনা হলেও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজ রাখা। মাসে মাসে সে মর্টগেজ দিচ্ছিল। মাসিক পেমেন্ট বাকি পড়লে ব্যাংক বাড়ি নিয়ে নেবে।

(খ) তারপর যাবে তাঁর গাড়ি (সম্ভবত তিনটি গাড়ি। একজন আমেরিকানের গড়পড়তায় তিনটি গাড়ি থাকে)। বাড়ির মতো গাড়িগুলোও সে মাসিক কিস্তিতে কিনেছে।

(গ) তার জিনিসপত্র—ফ্রিজ, টিভি, আসবাবপত্র চলে যাবে। এগুলোও মাসিক কিস্তিতে কেনা।

(ঘ) চলে যাবে তার স্ত্রী। বেকার স্বামী, যে ওয়েলফেয়ারে জীবনযাপন করছে, তার সঙ্গে বাস করবে আমেরিকান স্ত্রী ? হতেই পারে না। চাকরি যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে আমেরিকায় ডিভোর্সের হার ৭০ ভাগ। এই স্ট্যাটিসটিকস আমি আমেরিকা থেকে নিয়েছি। মনগড়া স্ট্যাটিসটিকস নয়।

আমাদের দেশের স্ত্রীরা যে স্বামীকে ছেড়ে মাঝে মাঝে চলে যান না তা না, তবে স্বামী অভাবে পড়ছে সেই কারণে কোনো স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে—এটা প্রায় কখনোই ঘটে না।

বরং উল্টোটা ঘটে। আমি এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে চিনতাম—যার স্ত্রী তাকে ছেড়ে বাপ-মার কাছে চলে গিয়েছিলেন। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর পর ভদ্রলোকের ব্যবসায় অবস্থা খারাপ হলো। দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। খবর পেয়ে স্ত্রী ছুটে এলেন। তার বক্তব্য হচ্ছে—ওর এমন খারাপ অবস্থায় আমি ওকে ছেড়ে থাকব তা কী করে হয় ?

আমি ভদ্রমহিলাকে বললাম, ভাবি! এখন আপনার কল্যাণে তিনি যদি আবার মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়ান তখন আপনি কি চলে যাবেন ?

তিনি বললেন, অবশ্যই ! ওই বদমাশের সঙ্গে আমি থাকব ? আমার কি বাপ-ভাই নেই ? আমি কি জলে ভেসে এসেছি ?

আচ্ছা, বাংলাদেশের মেয়েগুলো এত ভালো কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মিলিয়ন ডলার মামা

মে ফ্লাওয়ার নামের বইয়ে আমি লিখেছিলাম—প্রতিটি আমেরিকানের স্বপ্ন হলো মিলিওনিয়ার হওয়া। এটি তাঁদের প্রথম স্বপ্ন এবং অনেকের জন্য এটিই তাঁদের শেষ স্বপ্ন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, তবে খুব অল্প সংখ্যকই দেখেন। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখাটাকে ভালো চোখেও দেখা হয় না। অর্থটা খুব খারাপ জিনিস, তা ছোটবেলা থেকেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া চেষ্টা করা হয়। আমাদের কবিরা লেখেন—

'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।'

দারিদ্র্য আমাদের আসলে মহান করে না, মনের দিক দিয়ে ছোট করে তা পরের কথা কিন্তু ছেলেবেলাতেই কবির কথার ভাবসম্প্রসারণ করতে গিয়ে দারিদ্র্য সম্পর্কে আমাদের অনেক ভালো কথা লিখতে হয়।

জাগতিক স্বপ্নকে তুচ্ছ করে অন্য ধরনের স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টার জন্যই রবীন্দ্রনাথও লেখেন—

'ধন নয় মান নয় এতটুকু বাসা—
করেছিনু আশা'...

জীবনানন্দ দাশ আরেকটু অন্যরকম ভঙ্গিতে বলেন—

'অর্থ নয় কীর্তি নয় জ্ঞানলতা নয়
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়।'

AMARBOI.COM

এইসব কারণে আমরা অর্থকে তুচ্ছ করে বড় হওয়ার চেষ্টা করি—মিলিওনিয়ার ড্রিম থেকে দূরে থাকি। যারা তার পরেও মিলিওনিয়ার হয়ে যায় তাদের দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাই। সেই তাকানোয় বলার চেষ্টা করি—ব্যাটা তুই দলছুট মানুষ। আমরা ধরেই নিই যেহেতু তার প্রচুর অর্থ, সেহেতু সে মহা অসুখী একজন মানুষ। তার জীবন কাটছে মদে, মেয়েমানুষে এবং তার অর্থের পুরোটাই অসৎ পথে আসা। তার জন্য অপেক্ষা করছে নরকের তীব্র হুতাশন।

দেশ ছেড়ে যারা আমেরিকা নামক নেভার নেভার ল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দেন, নতুন দেশে তাঁদের চিন্তা-চেতনা দ্রুত বদলাতে থাকে। একসময় নিজের অজান্তেই তারা বুঝতে পারেন সুদূর শৈশবের শেখা 'অর্থই অনর্থের মূল'—এই আপ্তবাক্য সঠিক নয়, বরং অর্থের অভাবই অনর্থের মূল। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন অর্থের সংগ্রহে এবং একসময় আমেরিকানদের মতো মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। ক'জনের স্বপ্ন সফল হয় ? আমি বলতে পারছি না, কারণ আমার কাছে কোনো স্ট্যাটিসটিকস নেই। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

জানার চেষ্টা করেছি। যে শহরেই গিয়েছি জিজ্ঞেস করেছি—আচ্ছা বাংলাদেশের কেউ কি মিলিওনিয়ার হয়েছে ? না-সূচক জবাবই পেয়েছি। শুধু লস এঞ্জেলসে এক সিলেটি ভদ্রলোক সম্পর্কে বলা হলো—সম্ভবত তিনি মিলিওনিয়ার। কারণ ভদ্রলোক ক্যাডিলাক গাড়ি চালান, পাহাড়ের উপর বিশাল বাড়ি করেছেন। তবে নিশ্চিভাবে কেউ কিছু বলতে পারল না।

আমি একজন বাংলাদেশি সম্পর্কেই এক শ' ভাগ নিশ্চিত যে, তিনি মিলিওনিয়ার এবং মিলিয়ন ডলার তিনি কোনোরকম পরিশ্রম ছাড়া সংগ্রহ করেছেন। ভদ্রলোক দেশে বামপন্থী রাজনীতি করতেন। একদিন বামপন্থী রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিংবা জীবনের মোহের কাছে পরাজিত হয়ে আমেরিকা চলে গেলেন। কাজকর্ম করে খাওয়ার ট্রেনিং রাজনীতিবিদদের থাকে না। কাজেই আমেরিকা গিয়ে তিনি মহা বিপদে পড়ে গেলেন। আমেরিকায় প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের বাসায় বাসায় থাকেন—ছোটখাটো কাজ এখানে ওখানে কিছুদিন করেন, আবার ছেড়ে দেন। যাকে বলে চরম সংকট।

সংকট মোচনের জন্য আমাদের শেষ আশা হলো লটারি। ভদ্রলোক সেই পথ ধরলেন—অল্প কিছু টাকা হলেই লটো নামক আমেরিকান লটারির টিকিট কেনেন। টিকিট কেনার পর কিছুদিন তাঁর খুব ভালো যায়। তাঁর মন বলে—সব সমস্যার সমাধান হলো, এবার পেয়ে যাচ্ছি। লটারির ফল বের হওয়ার পর আবার বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পরবর্তী লটোর টিকিটের ডলার সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

পরিচিতদের বলেন এবার পাব, আমার মন বলছে পাব।

সবাই হাসে। লটোর লটারি কেউ জেতে না। যারা জেতে তারা অন্য গ্রহের জীব।

ভদ্রলোক কিন্তু লটো জিতে গেলেন। এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেলেন লটোতে। অবিশ্বাস্য এবং অকল্পনীয় ব্যাপার—অর্থের পরিমাণ বাংলাদেশি টাকায় চার কোটি টাকারও বেশি। ভদ্রলোক টিকিট জমা দিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এক মিলিয়ন ডলার ট্রান্সফার হয়ে গেল। তিনি অনেকদিন পর শান্তিতে ঘুমাতে গেলেন।

তাঁর নাম আতিকুর রহমান সালু। তিনি গুলতেকিনের আপন ছোটমামা। থাকেন নিউজার্সিতে। কী করেন ? কিছুই করেন না। লটোর টাকা ভাঙিয়ে খান। তাঁর বাড়ি, গাড়ি, সংসার খরচ সবই লটোর কল্যাণে এবং তিনি আছেন মহা সুখে। কবিতা লেখেন, গান লেখেন, সেই গানে নিজের সুর দেন। নিজেই গান। সবই রাজনৈতিক কবিতা। রাজনৈতিক গান। একটি গানের প্রথম কলি হলো—

'মওলানা ভাসানী, তুমি কোথায় ?
তুমি কোথায় ?'

যেহেতু হাতে প্রচুর অবসর সময় সেহেতু নিজেকে রাজনীতিতে আবার জড়িয়ে দেন। এবং আমেরিকান রাজনীতি। এদের পলিটিক্যাল মিটিং তিনি মিস করেন না। স্থানীয় সিনেটরের সঙ্গে তাঁর সখ্য হয়েছে। নর্থ আমেরিকার বাঙালি রাজনীতির সঙ্গেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

তিনি জড়িত। তাঁর মাথায় এখন আছে বাংলাদেশের ফারাক্কা সমস্যা। তিনি ফারাক্কা কমিটির সেক্রেটারি। সম্প্রতি ফারাক্কা কমিটি বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সাফল্যজনকভাবে শেষ করেছে। ফারাক্কা বিষয়ে একটি শক্ত আমেরিকান লবি তৈরিতে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয়। নিউজার্সি এলাকার নির্বাচিত সিনেটর তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন—সেই চিঠি আমিও পড়লাম। চিঠিতে সিনেটর লিখেছেন—ফারাক্কার এই সমস্যা তুলে ধরার ব্যাপারে আমার যা করণীয় তা আমি অবশ্যই করব।

আমার স্ত্রী তাঁর এই মামার খুব ভক্ত। তার কাছে শুনেছি—ভদ্রলোক বিচিত্র স্বভাবের মানুষ, অতি ভালো মানুষ। দেশে বেশিরভাগ সময় থাকতেন জেলে। ছাড়া পেলে গুলতেকিনদের বাসায়। গুলতেকিনের ভাষায়—আমার ছোট মামার মতো মজার মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নি। তাঁর দোষ থাকলে থাকতে পারে, মানুষ মাত্রই দোষ থাকে। কিন্তু আমার এই মামার সৎগুণের সঙ্গেই শুধু আমরা পরিচিত। সেই সৎগুণের একটা হলো—দিলদরিয়া স্বভাব। তাঁর মজার সব পাগলামি ছোটবেলায় আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।

আমেরিকায় তাঁর পাগলামি বেড়েছে না কমেছে তা দেখার জন্য সপরিবারে তাঁর বাড়িতে গেলাম। ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে এই উপলক্ষে একটা গান রচনা করলেন এবং সুর দিয়ে গাইলেন। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, আমার ভাগ্নি-জামাই লেখালেখি করে। লোকজন তার লেখা পড়ে। কেউ যখন তার নাম বলে তখন আমার খুব ভালো লাগে। আমি তাকে সোনার দোয়াত-কলম উপহার দিতে চাই। বলেই নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমার কিছুতেই মাথায় আসছে না এই আমেরিকায় তিনি সোনার দোয়াত-কলম কোথায় পাবেন! ঘণ্টাখানেক পর তিনি এক বোতল পেপসি নিয়ে উপস্থিত হলেন। সোনার দোয়াত-কলম সম্পর্কে আর কোনো সাড়াশব্দ করলেন না।

আমি মজা পেলাম। মামার বাড়িতে তিন ঘণ্টা থাকার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েছিলাম—থাকলাম তিন দিন। গল্পগুজব, হাসি-তামাশা চলতে লাগল। মামিকেও আমার খুব পছন্দ হলো—সহজ-সরল, হাসি-খুশি মানুষ। খাঁটি বাংলাদেশি মেয়ে। স্বামীর নানাবিধ পাগলামিতে বিপর্যস্ত...। একপর্যায়ে আমাকে বললেন, দেখুন না আপনার মামার কাণ্ড—আপনার মামা বলছে পুরোপুরি দেশে চলে যাবে। জিনিসপত্র সব বাঁধাছাদা করে এক বছর ধরে বসে আছি।

বলেন কী?

সত্যি কথা। এই যে আপনাদের খেতে দিচ্ছি, থালাবাসন নতুন করে কিনতে হয়েছে, আমাদের সবকিছু প্যাক করা।

বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

ইন্টারেস্টিং মোটেই না। আমেরিকান সিটিজেনশিপ থাকলে কত সুবিধা। আমি সিটিজেন হয়েছি। বাচ্চা দুটি তো জন্মসূত্রেই সিটিজেন। কিন্তু আপনার মামা সিটিজেনশিপ নেবে না। সিটিজেনশিপ নিলে নাকি বাংলাদেশকে খাটো করা হবে। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

সে করবে না। আচ্ছা আপনি বলুন—তার একার সিটিজেনশিপ নেওয়া না নেওয়ায় বাংলাদেশের কী যায় আসে ?

বাংলাদেশের কিছু যায় আসে না, উনার যায় আসে। একেকজন মানুষ একেক রকম। আপনি কি কখনো অন্য কোনো বাঙালিকে শুনেছেন—আমেরিকায় গাড়ি চালাতে চালাতে মওলানা ভাসানী বিষয়ক গান গাইতে ?

তিন দিন পার করে ফিরছি, মামা আমার হতে একটা প্যাকেট তুলে দিলেন। খুলে দেখি সত্যি সত্যি সোনার কলম। মামা বললেন, ১৮ ক্যারেট গোল্ড। পুরোপুরি গোল্ড হলে ভালো হতো। পুরোপুরি সোনা দিয়ে ওরা কলম বানায় না। জামাই, কলম পছন্দ হয়েছে ?

সোনার কলম আমার পছন্দ হয় নি। কারণ আমি লিখি বলপয়েন্টে। তবে মানুষটিকে পছন্দ হয়েছে। সোনামোড়া কলম পাওয়া যায়, সোনামোড়া মানুষের বড়ই আকাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

দেশের সব পত্রিকায় হাস্যকর একটা কলাম থাকে—আজকের দিনটি কেমন যাবে ? হরোস্কোপ। মানা না-মানা পরের ব্যাপার। এই অংশটুকু সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন। আমি নিজে এই জাতীয় ব্যাপারগুলোর ঘোর বিরোধী। তারপরেও চট করে একফাঁকে দেখে নিই বৃশ্চিক জাতকের জন্য আজকের দিনটি কেমন যাবে।

আমেরিকান পত্রিকাগুলোতেও এরকম কলাম আছে। এক মাস ধরে সেই কলাম পড়লাম। মজার একটা ব্যাপার দেখলাম—ওদের দিন কেমন যাবের সঙ্গে আমাদের দিন কেমন যাবের মিল নেই। যেমন একবার দেখলাম লেখা আছে—

> বৃশ্চিক রাশির জন্যে এই দিন শুভ।
> জাতকের নতুন অটোমোবাইল কেনার সম্ভাবনা আছে।

আমাদের দেশে কখনোই কোনো জাতকের বেলাতে লেখা হবে না—মোটরগাড়ি কেনার সম্ভাবনা আছে।

আরেকদিন দেখলাম লেখা হলো—

> আজকের দিনটি সাবধানতার সঙ্গে পার করা উচিত।
> অপরিচিত কারোর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক বিপজ্জনক হতে পারে।

তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে, হরোস্কোপ শুধু কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছে তার ওপর নির্ভর করবে না, কোন দেশে জন্ম হলো তার ওপরও নির্ভর করবে ? নাকি দেশের রুচি অনুযায়ী এইসব তৈরি করা হয় ?

আমার ইচ্ছা আছে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে পৃথিবীর সব দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত হরোস্কোপ নিয়ে একটি লেখা তৈরি করার। লেখাটা এ রকম হবে, বৃশ্চিক রাশির জাতক—বাংলাদেশে জন্মালে ওই দিনে কী হবে ? চীনে জন্মালে কী ? ফ্রান্সে কী ? আমেরিকায় এবং রুয়ান্ডায় কী ?

হরোস্কোপ ছাড়াও আমেরিকান পত্রিকায় আর যেসব জিনিস মন দিয়ে পড়েছি তা হলো—হাজার হাজার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পড়ে আক্কেলগুড়ুম হওয়ার মতো অবস্থা। মেয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে—

> আমার বয়স ২৫, আমি দেখতে অ্যাট্রাকটিভ, চুলের রঙ ব্লন্ড, চোখ বাদামি। ওজন ১৩৫ পাউন্ড। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুরুষদের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্ক (intimate relation) স্থাপনে আগ্রহী। পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়সী পুরুষেরা যোগাযোগ করুন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আরেকটি মেয়ের বিজ্ঞাপন—

> শরীরের বিনিময়ে (In exchange of sex) কোনো পুরুষের অ্যাপার্টমেন্টে শেয়ার হতে চাই। আলাদা ঘর থাকতে হবে। এবং অবশ্যই আলাদা বাথরুম।

ওদের পত্রিকা পড়লে একটা জিনিস বোঝা যায়—এরা খুব রসিক। পত্রিকার খবরগুলো মজা করে লেখা হয়, শিরোনামেও রহস্য করার চেষ্টা করা হয়। পত্রিকার পুরো এক পাতা জুড়ে থাকে রসিকতা। এক স্ট্যাটিসটিকস বলছে, শতকরা ৮৫ ভাগ আমেরিকান শুধু ওই পাতাটাই পড়েন। শেষের দিকে আমারও আমেরিকানদের মতো অবস্থা হলো—আমিও খবরের কাগজের ওই পাতাটাই শুধু পড়া শুরু করলাম।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায় এডিটোরিয়াল নামক রচনা খুব গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। এদের অনেক কাগজে দেখেছি যেখানে এডিটোরিয়াল বলে কিছু নেই। ওদের যুক্তি—যে রচনা কেউ পাঠ করে না সেই রচনা আমরা ছেপে শুধু শুধু পাতা নষ্ট করব কেন! বরং সেই পাতাটায় বিজ্ঞাপন ছাপা যায়।

আমেরিকা কি বিজ্ঞাপনের দেশ? পত্রিকা ওল্টালে তা-ই মনে হয়। ৬০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজে ৪৫ পৃষ্ঠা থাকে বিজ্ঞাপন।

কিছু কিছু বিজ্ঞাপন অত্যন্ত জটিল ধরনের। বিশেষ কোনো খবর বিশেষ এক দল মানুষকে দেওয়া হচ্ছে—দলভুক্ত না হলে কেউ তার মর্ম বুঝবে না। এ রকম একটি বিজ্ঞাপন দিলাম, দেখুন তো আপনারা তার মর্ম উদ্ধার করতে পারেন কি না—

August 6
Anniversary of Electrocution
Greeting Cards on sale

AMARBOI.COM

বঙ্গানুবাদ—

আগস্ট ৬
বিদ্যুতে হত্যাবার্ষিকী
শুভেচ্ছা কার্ড সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে

পারলেন কিছু বুঝতে? আমি অনেক চেষ্টা করেও পারি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

চখা ও চখি

আমেরিকান প্রেমিক-প্রেমিকা এবং স্বামী-স্ত্রী পথে বের হলেই মনে হয় তারা একটা ঘোরের মধ্যে চলে এসেছেন। মেয়েগুলো সবসময় 'সখী ধর ধর' অবস্থা। সারাক্ষণ লেগেই থাকবে পুরুষের শরীরে। এতেও রক্ষা নেই। কিছুক্ষণ পর পর চোখ বন্ধ করে ঠোঁট উঁচিয়ে এমন ভঙ্গি করবে যেন এই মুহূর্তে তাকে চুমু না খাওয়া হলে সে হৃদয় যাতনায় মারা যাবে। কে দেখছে, কে দেখছে না তাতে কিছু যায় আসে না। যেন এই জগতে চখাচখিসম তারা দুজনই আছে। বাকি পৃথিবী বিলুপ্ত।

প্রথমদিকে বাচ্চাদের নিয়ে এই দৃশ্য দেখতে অস্বস্তি বোধ হতো। শেষটায় সহ্য হয়ে গেল। তরুণ-তরুণী লেপ্টালেপ্টি করছে না দেখলেই বরং খারাপ লাগত। মনে হতো ব্যাপারটা কী? ওরা কি সুখে নেই? ওদের হয়েছেটা কী?

আমার অনেক খারাপ অভ্যাসের একটি হচ্ছে পথের মানুষদের দিকে তাকিয়ে থেকে তাদের হাবভাব, চালচলন দেখা। গুলতেকিনের কাছে এজন্য অনেক বকা খাই—কী ব্যাপার, হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?

ওদের দেখছি।

দেখো। মুখের হাঁ বন্ধ করে দেখো। হাঁ করে দেখতে হবে নাকি?

আমেরিকান চখাচখিসম তরুণ-তরুণী দেখতে দেখতে ছোট্ট একটা আবিষ্কার করে ফেললাম। প্রৌঢ় আমেরিকানদের বিদেশিনী আঠার-উনিশ বছরের স্ত্রী কিংবা বান্ধবী। নাক চাপা দেখে মনে হয় এরা হয়তো ফিলিপিনো কিংবা চায়নিজ। এই মেয়েগুলো আমেরিকান মেয়েগুলোর চেয়ে একটু বেশি সরস। সারাক্ষণ বান্ধবের কোমর জড়িয়ে ধরে থাকে, মিনিটে একটা করে চুমু খায়, নানান ধরনের আদিখ্যেতা করে। আদিখ্যেতার বাড়াবাড়ি দেখে মনে হয় পুরোটাই নকল। ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার যথেষ্টই মজার। বর্তমান আমেরিকায় আন্তর্জাতিক বিবাহের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। বড় বড় কোম্পানি খোলা হয়েছে। এদের কাজ হলো—দরিদ্র দেশের অল্প বয়স্ক রূপবতীদের সঙ্গে ধনবান প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আমেরিকানদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। এমনিতে এই বুড়ো হাবড়াদের মেয়ে জুটছে না—তারা ভিড় করছে কোম্পানিগুলোতে। কোম্পানি ক্যাটালগ দিয়ে দিচ্ছে। ক্যাটালগে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের নানা ভঙ্গিমার ছবি (নগ্ন ছবিও আছে)। একজনকে পছন্দ করা হলো। বিয়ে হয়ে গেল। আমেরিকানের স্ত্রী হিসেবে ভিসা পেয়ে এই মেয়ে চলে এল আমেরিকায়। সফল হলো আমেরিকা আসার স্বপ্ন। এখন সেই মেয়ে ধীরে ধীরে তার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে আনতে শুরু করবে। প্রয়োজনে বুড়ো স্বামী ডিভোর্স দিয়ে নতুন একজনকে নিয়ে নেবে। প্রধান ব্যাপার বিয়ে নয়, প্রধান ব্যাপার আমেরিকায় আসা। স্বামী যত বুড়ো হয় মেয়েগুলোর জন্য ততই সুবিধা। বেশিদিন বাঁচবে না। মৃত্যুর পর সম্পত্তির পুরোটাই তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

কোন ধরনের মেয়ে আসছে ? বলতে পারছি না। সে আমার কাছে তথ্য নেই। ফিলিপাইন, হংকং-এর মেয়েরাই ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে। শিগগিরই হয়তো আরও সব দেশের মেয়েরা আসতে শুরু করবে। হেডোনিস্টিক সোসাইটির প্রলোভন এড়ানো খুব সহজ নয়।

আমেরিকান বুড়িদের জন্য বাইরের তরুণ স্বামী নেওয়া কখন শুরু হবে তা-ই ভাবছি। কারও কারও মাথায় এই আইডিয়া নিশ্চয়ই খেলতে শুরু করেছে। বিদেশি তরুণ স্বামী সাপ্লাইয়ের কোম্পানি রেজিস্টার্ড হবে কবে ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ডিজনিল্যান্ড

শেষপর্যন্ত আমার কন্যাদের সাধের ডিজনিল্যান্ড যাওয়া হচ্ছে। এনাহেইমের ডিজনি হোটেল থেকে টিকিট কেটে মনোরেলে উঠে বসেছি। মনোরেল প্রায় উড়ে যাচ্ছে। ডিজনিল্যান্ডকে একটা চক্কর দিয়ে মনোরেল ভেতরে ঢুকল, আমরা নামলাম—নেমেই মোহিত হয়ে গেলাম। বর্ণাঢ্য এক জগৎ, যে জগতের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের কোনো মিল নেই। শিশুর কল্পনার জগৎ ওয়াল্ট ডিজনি সাহেবের মতো আর কেউ বোধহয় ধরতে পারেন নি। তাঁর ভেতরে নিশ্চয়ই একজন শিশু বাস করত। সে শিশু ডিজনি সাহেবকে কখনো ছেড়ে যায় নি। শিশুটি ছিল বলেই তাঁর চোখ দিয়ে তিনি এমন অপূর্ব এক সৃষ্টি করতে পারলেন।

ডিজনিল্যান্ড অনেক অংশে ভাগ করা—একদিকে রূপকথার জগৎ, অন্যদিকে ভবিষ্যতের জগৎ। শিশুদের শহর ট্রিনটন, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট—কী নেই! সবকিছু দেখে ঘরে ফিরতে তিন-চার দিন লাগার কথা। আমাদের হাতে আছে মাত্র একদিন। যা দেখার একদিনেই দেখতে হবে। কী দিয়ে শুরু করব ভাবছি, তখনি আমার ছোট মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মিকিমাউস আসছে! মিকিমাউস আসছে! মিকিমাউস সত্যি সত্যি হপ হপ শব্দ করতে করতে আমাদের দিকেই আসছে। বেঁটেখাটো কেউ একজন মিকি মাউসের পোশাক পরেছে। কী সুন্দর বানিয়েছে! বাচ্চাদের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করল। বাচ্চারা তার সঙ্গে ছবি তুলল। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে এতদিনে আমেরিকা আসা সার্থক হলো।

প্রথম যা দেখতে পেলাম, তা হলো—চন্দ্রযানে করে গ্রহ-নক্ষত্র ভ্রমণ। স্টারওয়ার ছবির রকেটের মতো এক রকেটে আমাদের তোলা হলো। দরজা বন্ধ করা হলো। পর্দায় নির্দেশ ভেসে উঠল সিট বেল্ট বাঁধার। আমরা সিট বেল্ট বাঁধলাম। এক এক করে রকেটের ভেতরের বাতি নিভে গেল। রকেট যাত্রা শুরু করল। পুরো ব্যাপারটাই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিমুলেশনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। পর্দার ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে সিটে বসে আছি—সেই সিটগুলো কাঁপছে, বাঁকছে। এতই বাস্তব যে, আমি পর্যন্ত ঘাবড়ে গেলাম। রকেটের সামনে কোনো এক গ্রহ এসে পড়েছে, রকেট ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঁক নিচ্ছে, ভয়ে আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠছি।

গ্রহ-নক্ষত্র পার হয়ে তীব্র গতিতে আমরা ছুটছি। গতির কাঁপন লাগছে শরীরে। রকেট এবার আলোর গতি অতিক্রম করছে—আর আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এরা এই জিনিস করল কী করে?

রকেট-যাত্রার পর সাবমেরিন-যাত্রা। সাবমেরিনে করে সমুদ্রপ্রাণী দেখা। সাবমেরিনে চড়লাম—ভুস করে সাবমেরিন চলে গেল পানির নিচে। সাবমেরিনের জানালার পাশে বসে দেখা হলো অদ্ভুত সব দৃশ্য। সেই অদ্ভুত দৃশ্যের একটি হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মৎস্যকন্যা। নকল সেই কন্যাকে দেখে কে বলবে এটি রাবারের প্রাণী। দীর্ঘ চুলের দীঘল চোখের মৎস্যকন্যা। কী মায়া নিয়ে তাকাচ্ছে। হাতছানি দিচ্ছে। ও কী ? মৎস্যকন্যার দিকে ভয়ংকর এক শার্ক ছুটে আসছে। উত্তেজনায় আমাদের বুক টিপ টিপ করছে—কী হয় কী হয় !

ওয়াইল্ড ওয়েস্টে গিয়ে ট্রেনে চড়লাম। ভয়ংকর সেই ট্রেনযাত্রা। নিমিষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যাচ্ছে, নিমিষে নেমে যাচ্ছে। আবার উঠছে। সারাক্ষণ মনে হচ্ছে, এই বুঝি পাহাড়ের চূড়া থেকে ট্রেন ছিটকে পড়ে যাবে...।

বাচ্চাদের নিয়ে ভৌতিক বাড়িতে ঢুকলাম। সেখানে ভৌতিক সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। হলঘরে একদল নারী-পুরুষ নাচছে। না, তারা মানুষ নয়। ছায়ামূর্তি। এই তাদের দেখা যাচ্ছে—এই দেখা যাচ্ছে না। এইসব তারা করছে কী করে ?

পপ গানের সুপারস্টার মাইকেল জ্যাকসন ডিজনিল্যান্ডের একটা অংশ নিজ খরচে তৈরি করে দিয়েছেন—অংশটির নাম 'পাইরেটস অব দি ক্যারিবিয়ান'। প্রাচীন জলদস্যুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটানোর জন্য উঠলাম নৌকায়—সেই নৌযাত্রা মনে রাখার মতো। একপর্যায়ে জলদস্যুদের কামানের গোলাগুলির ভেতর পড়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ আতঙ্ক—এই বুঝি জলদস্যুদের কামানের গোলাগুলি এসে পড়ল আমাদের ওপর। নুহাশ তারস্বরে কাঁদছে। আর বলছে, বাংলাদেশে যাব, বাংলাদেশে যাব। অন্যেরা উত্তেজনায় কাষ্ঠ হয়ে আছে।

দুপুর দুটায় ডিজনিল্যান্ডে প্যারেড হয়। ডিজনির বিভিন্ন চরিত্র নাচ-গান করতে করতে একটা শোভাযাত্রা বের করে। আগেই শুনেছি, এই প্যারেড হচ্ছে ডিজনিল্যান্ডের প্রাণ। প্যারেড যেন মিস না হয় সে জন্য দুটার আগেই প্যারেডের নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলাম।

প্যারেড শুরু হলো। বাচ্চাদের কথা দূরে থাকুক, প্যারেড দেখে আমি মুগ্ধ।

বাঘ আসছে, ভালুক আসছে, জেব্রা, জিরাফ আসছে—নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে আসছে। যেমন সুর, যেমন ছন্দ তেমনি গমগমে আওয়াজ। পুরো ডিজনিল্যান্ড গানের ঝংকারে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। প্যারেডের সৌন্দর্যের কাছে এতক্ষণ যা দেখেছি সব ধুয়ে মুছে গেল।

রাত আটটায় হয় আরেকটি ভুবনবিখ্যাত শো। ওয়াটার শো। পানির ঝরনা দিয়ে তৈরি হয় পর্দা। সেই পর্দায় দেখানো হয় জমকালো দৃশ্য। শুনলাম—দেখার মতো। অনেকেই বারবার ডিজনিল্যান্ডে ফিরে আসে শুধু এই জলবিষয়ক শো দেখার জন্য। খুব ভিড় হয়—আগেভাগে জায়গা না পেলে সমস্যা। আমরা এক ঘণ্টা আগে গিয়ে দেখি তিল ধারণের জায়গা নেই।

শো শুরু হলো। এই আসছে যুদ্ধজাহাজ। জাহাজে দেখা যাচ্ছে সিনডেরেলাকে। আসছে আকাশ-উঁচু ড্রাগন। ড্রাগন নিঃশ্বাস ফেলল—আগুন ধরে গেল চারপাশে। সহজ আগুন না, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। মিকিমাউস তার দলবল নিয়ে নৃত্য শুরু করল। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা দেখি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

রাত বারোটা পর্যন্ত রইলাম। শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন, পা চলতে চায় না; তবে মন প্রফুল্ল।

ফেরার পথে মনের প্রফুল্লতা অনেখানি কমে গেল। দেশে ফেলে আসা শিশুদের কথা মনে পড়তে লাগল। এই সুন্দর রূপকথার জগৎ দরিদ্র দেশে জন্মেছে বলেই ওরা দেখবে না। এর কোনো মানে হয়?

পৃথিবী কি চিরকাল এরকম থাকবে? বদলাবে না? আমরা কি একদিন আমাদের শিশুদের জন্য এমন জগৎ তৈরি করতে পারব না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ক্যাম্পিং

আমেরিকায় এসে ক্যাম্পিং করব না তা তো হয় না। নর্থ ডাকোটায় যখন ছিলাম—ক্যাম্পিং নামক অবসর যাপন প্রায়ই করা হতো। তাঁবু নিয়ে চলে যেতাম জঙ্গলে। সাধারণ জঙ্গল না, গহীন জঙ্গল। তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গলে রাত্রিবাস। রাতে বুনো পাখি ডাকবে, ভালুকের পায়ের শব্দ পাওয়া যাবে, ভয়ে গা ছমছম করবে, তবেই না মজা। এই মজা হাজার গুণে বেড়ে যাবে যদি রাতে আকাশে চাঁদ থাকে। চাঁদের আলোয় নৌকা নিয়ে লেকে বেড়ানো। দিনে বড়শি ফেলে মাছ ধরে সেই মাছ টাটকা ভেজে খাওয়া। আমেরিকান মাছগুলো আবার বোকা টাইপের। ছিপ ফেললেই ধরা দেয়। যে আমি জীবনে কোনোদিন ছিপ হাত দিয়ে ধরি নি, সেই আমিও ছয় কেজি ওজনের রেইনবো ট্রাউট ধরেছিলাম। মাছগুলো এমনই বোকা।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ফজলুল আলমের বাড়িতে উঠেছি। তাকে ক্যাম্পিংয়ের কথা বলতেই সে বলল, কোনো সমস্যা নেই, আমি ক্যাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করছি। ক্যাম্পিংয়ের তাঁবু-টাবু সবই আমার আছে। হারিকেন আছে, স্টোভ আছে, মাছ মারা বড়শিও আছে। আমার খুব উৎসাহ। আমার কন্যাদের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। তারা ডিজনিল্যান্ড দেখতে এসেছে, জঙ্গলের ভেতর তাঁবু খাটিয়ে বসে থাকতে আসে নি। তা ছাড়া জঙ্গলে নিশ্চয়ই সাপখোপ আছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখবে বালিশে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে আছে র‍্যাটল স্নেক... কোনো দরকার নেই। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের রাজি করলাম। আমি এক শ' ভাগ নিশ্চিত, জঙ্গলের তাঁবুতে রাত্রিবাস তাদের ভালোই লাগবে। মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা হবে।

দুপুরে লটবহর নিয়ে ক্যাম্পিং স্ট্যান্ডে উপস্থিত হলাম। আমার মন খারাপ হয়ে গেল—লেকের পাশে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। চারদিকে ধু ধু বালি—দু'একটা ন্যাড়া গাছ এদিকে ওদিকে দেখা যাচ্ছে। লেক যা আছে তাও কৃত্রিম, মানুষ মাটি খুঁড়ে পানি ভর্তি করে লেক বানিয়েছে। ফজলুলকে বললাম, জঙ্গল কোথায়—এ তো ধু ধু মরুভূমি।

ফজলুল বলল, গোটা ক্যালিফোর্নিয়াটাই তো মরুভূমি। জঙ্গল পাব কোথায়? মরুভূমির ক্যাম্পিংও খুব খারাপ না। অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা হবে। সে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ভোরে এসে নিয়ে যাবে।

এখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করা আর বাড়ির পেছনে তাঁবু খাটিয়ে বাস করার ভেতর তফাৎ কিছু নেই। এতদূর এসে ফেরত যাওয়ার মানে হয় না। তাঁবু খাটানো হলো। খাবার ঘর থেকেই রান্না করে আনা হয়েছিল—সেই খাবার খাওয়া হলো।

আমি বাচ্চাদের বললাম, চলো যাই হ্রদের পানিতে গোসল করে আসি। কিছুটা মজা পাবে। তারা গম্ভীর মুখে বলল, তুমি একা যাও বাবা। আমরা নকল হ্রদে গোসল করব না। আমি একাই পানিতে দাপাদাপি করলাম। মেয়েরা থমথমে মুখ করে বসে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

গরমেও তারা খানিকটা কাহিল। মরুভূমির বালি তেতে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। সবাই বলল, সন্ধ্যার পর তাপ কমতে থাকবে, তখন খানিকটা আরাম লাগতে পারে। রাতে ঠান্ডা পড়ারও সম্ভাবনা।

আশ্চর্য কাণ্ড, রাত আটটার দিকে ঝপ করে মাঘ মাসের শীত পড়ে গেল। থরথর করে কাঁপছি। বাইরে দাঁড়ানো যায় না এমন অবস্থা। সবাই তাঁবুর ভেতর ঢুকে চুপচাপ বসে আছি। শীত ক্রমেই বাড়ছে। আল্লাহ-আল্লাহ করে রাতটা পার হলে বাঁচি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারি। আমাদের আশপাশে অনেক তাঁবু পড়েছে। তাদের শরীরে মনে হয় গণ্ডারের চামড়া। শার্ট-প্যান্ট পরে ঘুরছে।

স্প্যানিশদের এক তাঁবু পড়েছে আমাদের গা ঘেঁষে। ওরা ছেলেপুলেসহ এমন নাচ শুরু করল। গান হচ্ছে—ওলা ওলা ওলা। সেইসঙ্গে উদ্দাম নৃত্য। এ তো দেখি ভালো যন্ত্রণা হলো। ভাগ্য ভালো প্রচুর লেপ-তোষক, স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে আসা হয়েছে। শীতে জমে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা হয়তো ঘটবে না। রাত দুটা বাজার আগে সবাই শুয়ে পড়লাম। তখন আমার মেজোমেয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাবা, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সে কি, নিঃশ্বাস বন্ধ হবে কেন?

জানি না। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

টর্চ জ্বালিয়ে দেখি, সত্যি সত্যি তার চোখমুখ শক্ত হয়ে আছে। হাত-পা কাঁপছে। তাঁবু খুলে তাকে বাইরে আনতেই সে স্বাভাবিক। তাঁবুতে ঢুকলেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আধমরা হয় যায়, বাইরে আনলেই সুস্থ। বুঝতে পারছি ব্যাপার আর কিছুই না, ক্লাস্টোফোবিয়া। বন্ধ ঘরের ফোবিয়া। আমরা সবাই পারিবারিকভাবে নানান ফোবিয়ায় আক্রান্ত। গুলতেকিন ছাড়া সবারই আছে—এরাকনোফোবিয়া—মাকড়সা-ভীতি। একটা মাকড়সাকে পঞ্চাশটা বাঘের মতো ভয়ংকর মনে হয়। আমার আছে উচ্চতা-ভীতি। এবার একজনকে পাওয়া গেল ক্লাস্টোফোবিয়ার। কন্যাকে নিয়ে আমাকে রাত কাটাতে হবে তাঁবুর বাইরে। দুজন গরম কাপড় পরলাম। কম্বল দিয়ে নিজেদের মুড়ে তাঁবুর বাইরে বসে রইলাম। সারাক্ষণ বসে থাকা যায় না। মাঝে মাঝে হাঁটাহাঁটি করি। মেয়ে একসময় দয়াপরবশ হয়ে বলল, বাবা, তুমি তাঁবুতে শুয়ে থাকো। আমি একা বাইরে বসে থাকব, অসুবিধা হবে না। আমার মোটেই ভয় লাগছে না।

আমি তো আর আমেরিকান বাবা না যে, মেয়েকে তাঁবুর বাইরে একা বসিয়ে রেখে ঘুমাতে যাব। আমিও তার পাশেই বসে রইলাম। একটা লাভ হলো—মরুভূমির তারাভরা আকাশ মনের সাধ মিটিয়ে দেখা গেল। মরুভূমির আকাশের তারা কী যে সুন্দর, কী যে সুন্দর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

অষ্টম নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন

যদিও নাম মহাসম্মেলন, তারপরেও আমি ভেবেছিলাম ছোটখাটো কোনো ঘরোয়া ব্যাপার হবে। আজকাল মহা বিশেষণটি আমরা যত্রতত্র ব্যবহার করি। ছোটখাটো মূর্খকেও বলি মহামূর্খ। কাজেই মহা বিশেষণের তেমন গুরুত্ব নেই।

সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আক্কেলগুড়ুম। মহা আসলেই মহা। হুলস্থুল ব্যাপার। হোটেল হিল্টন নামের অত্যাধুনিক হোটেলের চার শ' কামরা ভাড়া করা হয়েছে।

হোটেল লবিতে মেলা বসেছে—বাংলাদেশি বই, শাড়ি, গানের ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। ইন্ডিয়ান বাঙালিরা দিয়েছেন গহনার দোকান, পোশাকের দোকান। এক কোনায় মিষ্টিপানের খিলি বিক্রি হচ্ছে। এক ডলারে এক খিলি মিষ্টি পান।

প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। বাংলাদেশ কখনো দেখে নি এমনসব ছেলেমেয়েরা অপূর্ব সব ছবি এঁকেছে। পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে, বাঁশবনের মাথায় চাঁদ উঠেছে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের একজন ড. নবীর সঙ্গে দেখা—হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথায় যাচ্ছেন। আমি বললাম, নবী? এ-তো দেখি মচ্ছব বসে গেছে।

নবী তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, সম্মেলন দু'ভাগ হয়ে গেছে। দু'ভাগ না হলে দেখতে কী অবস্থা।

দু'ভাগ হয়েছে মানে?

একইসঙ্গে বোস্টনেও আরেক সম্মেলন হচ্ছে।

আমি আতঙ্কিত হয়ে বললাম, কোনটা আসল কোনটা নকল?

আমাদেরটা আসল। ওরা আমাদের সম্মেলনের ওপর ইংজাংকশান জারি করার জন্য কেইস করে দিয়েছে। কেইসে আমরা জিতেছি।

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, এরমধ্যে মামলা মোকদ্দমাও হয়ে গেছে?

নবী জবাব দিতে পারল না। তার ওয়াকিটকিতে পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছে—কেউ কোনো জরুরি ম্যাসেজ দিচ্ছে। আমি ঘুরে ঘুরে উৎসব দেখছি। আশ্চর্য! বাংলাদেশের এত মানুষ আছে আমেরিকায়? এত উৎসাহ তাদের সম্মেলন নিয়ে?

এক ছেলে ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, স্যার, আমি আপনার ভক্ত।

আমি বললাম, কী রকম ভক্ত? সাধারণ ভক্ত না মহাভক্ত?

মহা!

মহাভক্ত হলে প্রমাণ দাও। সারা দিন চা খেতে পারি নি। দেখি এক কাপ চা খাওয়াতে পার কি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ছেলে উধাও হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে উপস্থিত। আমি তার দিকে ভালো করে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলাম—আমেরিকান ভাবভঙ্গি সে আয়ত্ত করে নিয়েছে। একটা কান ফুটো করে এক কানে দুল পরেছে। এক কানে দুল পরা ছেলে ভক্ত আমার বেশি নেই বলেই আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম, কী নাম ?

স্যার, আমার নাম আমান।

কানে দুল পরেছ কেন আমান ?

আমান বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। দুল পরার রহস্য ফাঁস করল না।

সম্মেলন কেমন লাগছে ?

খুব ভালো।

বাংলাদেশের এত মানুষ একসঙ্গে দেখে আনন্দ হচ্ছে না ?

খুব আনন্দ হচ্ছে, স্যার।

বেশ তাহলে যাও—আনন্দ করো।

আমি আপনার জন্য এক কার্টন বেনসন সিগারেট নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে এসেছি। আমি জানি আপনি বেনসন খান। আপনার সম্পর্কে আমি সবই জানি।

আমানের সিগারেটের কার্টন আমি নিলাম, এই পর্যন্ত বুঝলাম আমাকে যতটা জানে বলে তার ধারণা ততটা সে জানে না। আমি বেনসন খাই না—ফাইভ ফাইভ হচ্ছে আমার প্রিয় ব্র্যান্ড। এই তথ্য অবশ্যি আমানকে জানতে দিলাম না। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, ডান কানের দুল ঝনঝন করতে করতে সেও আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। সে এক মজার দৃশ্য।

মহাসম্মেলন উদ্বোধন করা হলো। যেহেতু আমি গেস্ট অব অনার—আমাকে মঞ্চে মূর্তির মতো বসে থাকতে হচ্ছে। বক্তৃতায় কী বলব কিছুই মাথায় আসছে না। গলা শুকিয়ে আছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরান পাঠ করা হলো। অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকেও পাঠ করার কথা—কিন্তু সেই সময় গীতা, ত্রিপিটক এবং বাইবেল পাঠের লোক পাওয়া গেল না, যাদের ঠিক করা হয়েছে তারা উধাও। এক দলের ধারণা হলো, লোক না পাওয়ার ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত।

বাংলাদেশ সরকার এই সম্মেলনকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন দেখে ভালো লাগল। খালেদা জিয়ার বাণীর পরপরই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পাঠানো একটি বাণী পাঠ করা হলো। বিল ক্লিনটন বলছেন,

> মহান আমেরিকা পৃথিবীর নানা জাতির সংমিশ্রণেই মহান হয়েছে। এই মিশ্রণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের মানুষ যুক্ত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতি এনে মেশাচ্ছেন। এই মিশ্রণ অবশ্যই শুভ ও কল্যাণকর হবে...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

সুন্দর বাণী। আমার বক্তৃতার সময় আসতেই উদ্যোক্তা মাইকে বললেন, হুমায়ূন আহমেদ এখন ছোট্ট একটা বক্তৃতা দেবেন, বড় বক্তৃতা পরে দেওয়া হবে। শুরুতেই বাধা পেয়ে আমি আমার ছোট্ট বক্তৃতা দিতে উঠলাম। তখন হঠাৎ মনে হলো, মঞ্চে আসার একটু আগেই তো বাথরুমে গিয়েছিলাম। প্যান্টের জিপার কি লাগানো হয়েছে? হায় আল্লাহ, এত মানুষের সামনে জিপার লাগানো হয়েছে কি না এই পরীক্ষাই বা করব কীভাবে? ভয়াবহ টেনশন নিয়ে কথা বলতে হলে গভীর আবেগের কোনো বিষয় নিয়ে আসতে হয়। যেন আবেগ টেনশকে ছাড়িয়ে যায়। আমিও সেই পথ ধরলাম। গভীর আবেগের কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম...।

> আমার মেজো মেয়ে শীলার জন্ম হয়েছিল আমেরিকার ফার্গো শহরে। জন্মের পর পর আমার মা চিঠি লিখে জানালেন—বাবা, তুমি দেশে ফেরার সময় ফার্গো শহরের কিছু মাটি সঙ্গে করে নিয়ে এসো। জন্মস্থানের মাটির জন্য মানুষ কাঁদে। মাটি না আনলে বাংলাদেশে এসে তোমার মেয়ে খুব কাঁদবে। আমি সত্যি সত্যি দেশে আসার সময় ফার্গো শহরের এক পট মাটি নিয়ে এসেছিলাম...।
>
> আপনারা যারা আমেরিকায় বাস করছেন তাঁরা দেশ থেকে মাটি এনেছেন বলে মনে হয় না। আনেন নি বলেই সারাক্ষণ দেশের জন্য আপনাদের মন কাঁদে। মন কাঁদে বলেই আপনারা করেন উত্তর আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলন যেখানে সারাক্ষণ বিষাদ ও আনন্দময় কণ্ঠে উচ্চারিত হয়—বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ...।

AMARBOI.COM

বক্তৃতায় আবেগের অংশ ক্রমেই বাড়তে লাগল, কারণ আমাকে জিপারের ব্যাপারটি ভুলে থাকতে হচ্ছে।

ছোট বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমি রাজনীতিবিদদের মতো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ঘোষকের দিকে তাকালাম। ঘোষক কী পরিমাণ রাগ করেছেন সেটা দেখাই আমার উদ্দেশ্য। দেখা গেল তিনি হাসছেন, মনে হচ্ছে তেমন রাগ করেন নি।

বক্তৃতা শেষ করে চেয়ারে বসে লক্ষ করলাম, জিপার ঠিকই লাগানো আছে। এমন আবেগময় বক্তৃতা না দিলেও চলত।

রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম অংশে স্থানীয় শিল্পীরা। শেষ অংশে ঢাকা থেকে নিমন্ত্রণ করে আনানো বিখ্যাত এক গায়িকা (নাম না বলাই সংগত মনে করছি)।

স্থানীয় অনুষ্ঠান শুরু হলো। অপূর্ব অনুষ্ঠান। আমেরিকায় বাস করছেন বাঙালিরা অপূর্ব অনুষ্ঠান করলেন—নাচ, গান, মূকাভিনয় দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। ঢাকার বিখ্যাত গায়িকার আসার সময় হয়ে গেল—তিনি আসছেন না, দর্শকদের ভেতর মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মূল শিল্পী মঞ্চে না এসে হোটেল কক্ষে বসে থাকার রহস্যটা বিচিত্র। তিনি বলেছেন, এক রাতে গান গাইবার জন্য আমাকে দু' হাজার ডলার দেওয়ার কথা। ডলার হাতে না নিয়ে আমি গান গাইতে যাব না।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে দু' হাজার ডলারের চেক দেওয়া হলো। তিনি বললেন, না, আমি চেক নেব না। আমাকে নগদ দু' হাজার ডলার দিতে হবে।

উদ্যোক্তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমেরিকায় সব কাজকর্ম চেকের মাধ্যমে। নগদ ডলারের লেনদেন নেই। এখন কোথায় পাওয়া যাবে দু' হাজার ডলার? রাত দুটায় ব্যাংক খুলবে না। টেলার মেশিন আছে। সেখান থেকে দু' শ ডলারের বেশি পাওয়া যাবে না।

শিল্পীকে বুঝানোর চেষ্টা করা হলো। তাঁর এক কথা—নগদ ডলার হাতে না নিয়ে গান গাইব না।

রাত দু'টায় অনেক যন্ত্রণা করে দু' হাজার ডলার জোগাড় করা হলো। শিল্পী ডলার গুণে নিশ্চিত হয়ে গান গাইতে গেলেন। গানের অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হলো, সবাই গান শুনে মুগ্ধ শুধু সেই গান অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের স্পর্শ করল না—তাঁরা বিষণ্ন হয়ে রইলেন।

গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে আমার নিজের একটা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা আছে। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন বলেই ফেলি। আমি তখন শাহজালাল হলের হাউস টিউটর। সংস্কৃতি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। প্রতিযোগিতামূলক গানের অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে আমি এ দেশের দু'জন নামি সংগীতশিল্পীকে নিয়ে এসেছিলাম। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে তাঁদের একজন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আমাকে খরচ দিতে হবে।

খরচ দিতে হবে মানে?

টাকা ছাড়া আমি বিচারকের দায়িত্ব পালন করব না।

বিচারকদের টাকা দেওয়ার কোনো নিয়ম তো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, বাজেটও নেই।

তাহলে ভাই বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না।

আমি অনেক কষ্টে আমার রাগ সামলে বললাম, আপনারা যে এসেছেন এতেই আমি খুশি। আসুন চা খান। চা খাওয়ার পর গাড়ি দিচ্ছি। গাড়িতে উঠে চুপি চুপি চলে যান।

চুপি চুপি চলে যাব কেন?

টাকা না পেলে আপনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন না—এটা যদি আমার ছেলেরা জেনে ফেলে তাহলে সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ যে ওরা আপনাকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবে। আজকালের উগ্র মেজাজের ছেলে। বুঝতেই পারছেন।

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, আচ্ছা যান টাকা লাগবে না, কয়েক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিন।

আমি দু' প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিয়ে বললাম, আপনাকে বিচারক হিসেবে রাখব না। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমার পছন্দ হয় নি। আসুন গাড়িতে তুলে দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমি যে টাকা চেয়েছি এটা কাউকে বলবেন না তো ?

নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনোদিন কাউকে বলব না।

আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারি নি। লেখার মাধ্যমে দুঃখজনক ঘটনাটা বলে ফেললাম। নর্থ আমেরিকা-বাংলাদেশ মহাসম্মেলনে এই ঘটনা না ঘটলে কোনোদিনই হয়তো বলা হতো না।

যাই হোক, সম্মেলন প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চমৎকার সম্মেলন হয়েছে। পলিটিক্যাল ফোরামে কিছু অসাধারণ প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে। দেশ প্রসঙ্গে প্রবাসীদের নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা-ভাবনায় একটা জিনিসই ফুটে উঠেছে—ভালোবাসি। দেশকে আমরা ভালোবাসি।

আলাদা করে সাহিত্য অনুষ্ঠান হলো। সভাপতিত্ব করলেন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু পিন্টু। সেখানে প্রবাসী সাহিত্যসেবীরা হাহাকার নিয়ে প্রশ্ন করলেন—আমরা কাদের জন্য লিখব ? কী লিখব ? বহুদিন আগে যে দেশ ছেড়ে এসেছি, যার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেই দেশ নিয়ে লিখব, না আমেরিকান জীবন যা এখন আমরা জানি তা নিয়ে লিখব ? কারা পাঠ করবেন আমাদের রচনা ?

তাঁদের হাহাকার আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে, কিন্তু আমি তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। আপনাদের কাছে কি আছে ?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

আমার পুত্র-কন্যারা দীর্ঘ একমাস আমেরিকা দেখল, দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবস্থা এমন হয়েছে কিছু দেখলেই বিরক্ত হয়। ওয়াশিংটন ডিসির স্পেস মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়েছিলাম চাঁদের পাথর দেখার জন্য। তারা মুখ সরু করে বলল, চাঁদের পাথর এত ছোট ? আমি বললাম, পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকো, আমি ছবি তুলে দিই। তারা নিতান্ত অনিচ্ছায় চাঁদের পাথরে হাত রাখল। তারপরেও কত কী দেখার বাকি—ল্যুরে কেভার্নে স্ফটিকের গুহা, বিখ্যাত স্ট্যাচু অব লিবার্টি—স্বাধীনতার মূর্তি, নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম...তারা আর কিছু দেখবে না। তারা দেশে ফিরবে।

তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এ পর্যন্ত যা দেখলে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল কী ? তারা একসঙ্গে বলল, ডিজনিল্যান্ড।

তারপর ?

বাকি সবটাই একরকম।

আমেরিকার কোন জিনিসটি তোমাদের মুগ্ধ করেছে ?

বড় মেয়ে বলল, এদের পাবলিক টয়লেটগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে। যেখানেই গেছি দেখেছি, কী অপূর্ব ঝকঝকে তকতকে পাবলিক টয়লেট ! অথচ এই টয়লেট নিয়ে আমাদের কী কষ্ট...।

বিশাল আমেরিকায় তোমার পছন্দ হলো এদের পায়খানা ?

হ্যাঁ। পায়খানা শব্দটা তুমি উচ্চারণ না করলেও পারতে।

জিনিস কিন্তু একই মা। আগে আমরা বলতাম টাট্টি। শব্দটা দীর্ঘ ব্যবহারে নষ্ট হওয়ার পর বলা শুরু হলো—পায়খানা। এটিও যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন বলছি টয়লেট। এই শব্দও এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমেরিকানরা এখন টয়লেট বলে না, বলে—'জন'। কিছুদিন পর 'জন' শব্দটাও নষ্ট হবে। তখন অন্য শব্দ বলতে হবে।

থাক। বক্তৃতা বন্ধ করো।

আমি বক্তৃতা বন্ধ করে মেজো মেয়েকে বললাম, আমেরিকার কোনো জিনিসটি তোমার ভালো লাগল ?

সে বলল, এরা যে কাউকেই যেখানে সেখানে সিগারেট খেতে দেয় না এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সিগারেটের গন্ধে আমার মাথা ধরে যায়, বমি আসে, অথচ দেশে যেখানে যাই সেখানেই সিগারেটের ধোঁয়া। অসহ্য! অসহ্য!

ছোট মেয়েকে বললাম, মা, তোমার কী ভালো লাগল ?

সে বলল, ডিজনিল্যান্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ডিজনিল্যান্ডের কথা তো একবার বলেছ। আর কী?

সে অনেকক্ষণ ভাবল। অনেক চিন্তা করে বলল, ডিজনিল্যান্ড আমার ভালো লেগেছে।

সব দেখা হয়েছে, শুধু যে জন্য আমেরিকা যাওয়া সেই নর্থ ডাকোটার ফার্গো শহর দেখা হয় নি। আমার জন্যই দেখা হয় নি। নর্থ ডাকোটা যাওয়ার পর সব পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পর মনে হলো—আমি একটা বড় ভুল করছি। পুরনো স্মৃতির কাছে কখনো ফিরে যেতে নেই। নর্থ ডাকোটায় এখন যদি যাই দেখব—সব বদলে গেছে। স্মৃতির সঙ্গে মিলবে না, মন খারাপ হবে; বরং স্মৃতি অবিকৃত থাকুক। টিকিট কেটেও ফেরত দিয়ে এলাম। এখন না, আরও পরে। যখন বুড়ো হয়ে যাব, স্মৃতি হবে বিবর্ণ ও ঝাপসা, তখন দেখা হবে হারানো বরফের শহর, স্মৃতিময় ফার্গো।

দেশে ফিরছি। ঢাকার কাছে প্লেন নামতে শুরু করেছে। প্লেনের ক্যাপ্টেন সিট বেল্ট বাঁধতে বলেছেন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—ঢাকা শহর দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, ওই যে ঢাকা সিটি।

অমনি আমার কন্যারা সিট বেল্ট খুলে জানালার কাছে ছুটে এসে চেঁচাতে লাগল, ওই যে ঢাকা, ওই যে ঢাকা...যেন তারা কত দীর্ঘদিন এই শহর দেখে নি।

আমার এই নোংরা ঢাকা শহর যে ডিজনিল্যান্ডের চেয়েও মোহনীয় তা কি আমার মেয়েরা বুঝতে পারছে? তাদের আমি আমেরিকা দেখিয়ে এনেছি—এখন তারা অবশ্যই বুঝবে তাদের নিজের দেশ নেভার নেভার ল্যান্ড আমেরিকার চেয়েও লক্ষগুণ সুন্দর। আমার জীবন ধন্য, আমি জন্মেছি এই দেশে।

ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন রানওয়ে টাচ করল। আমরা জন্মভূমি মায়ের কোলে ফিরে এসেছি। মা পরম আদরে আমাদের গ্রহণ করেছেন। এই আনন্দ আমি কোথায় রাখি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

মে ফ্লাওয়ার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

১

দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগে আনন্দিত হন না—এমন মানুষের সংখ্যা খুবই অল্প। আমি সেই খুব-অল্পদের একজন। বাইরে যাওয়ার সামান্য সম্ভাবনাতেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত হই। আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কারণ আছে—এখন পর্যন্ত আমি কোনো বিদেশযাত্রা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারি নি।

একবার কিছু লেখকের সঙ্গে চীন গিয়েছিলাম। আমাদের দলনেতা ফয়েজ ভাই। তিনি সারাক্ষণ আমাকে গার্ড দিয়ে রাখছেন যাতে হারিয়ে না যাই। তাঁর ধারণা প্রথম সুযোগেই আমি হারিয়ে যাব। হারালাম না, তবে চোখে খোঁচা লাগিয়ে মহা বিপদ ঘটালাম। ডাক্তার দুটি চোখ ব্যান্ডেজ করে বন্ধ করে দিলেন। পুরো অন্ধ। লেখকেরা মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি তাঁদের পেছনে তাদের হাত ধরে ধরে হাঁটছি। এই হচ্ছে আমার চীন দেখা।

পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে গিয়ে কী ঝামেলায় পড়েছিলাম একটু বলে নেই। সাত দিনের জন্যে গিয়েছি বোম্বে। এলিফেন্ট গুহা, অজন্তা-ইলোরা সব দেখা হলো। কোনোরকম ঝামেলা ছাড়াই হলো। এখন দেশে ফিরব। রাত তিনটায় প্লেন; বাংলাদেশ বিমান। বলা তো যায় না, আমার যা কপাল, প্লেন যদি আগেভাগে চলে আসে এই ভয়ে রাত ন'টা থেকে এয়ারপোর্টে বসে আছি। সঙ্গে টাকাপয়সা যা ছিল সব শেষ মুহূর্তের বাজারে শেষ করা গেল। এখন বিমানের জন্য অপেক্ষা। যথাসময়ে ইংল্যান্ড থেকে বিমান এল। বোর্ডিং পাস নিতে গেছি। বাংলাদেশ বিমানের লোকজন বলল, এথেন্স থেকে প্লেন ওভারবুকিং হয়ে এসেছে, আপনাকে নেওয়া যাবে না। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, সে-কী, চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো টিকিট ওকে করানো।

বললাম তো—যাত্রী বোঝাই। কিছু করা যাবে না।

প্লেন আমাকে রেখে চলে গেল। শীতের রাত। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এখানে কাউকে চিনিও না। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে...

এইসব তো ছোটখাটো বিপদ। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে একবার মহা বিপদে পড়েছিলাম। দুই কন্যা ও স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছি। পাসপোর্ট যাতে নিরাপদে থাকে সেইজন্যে গুলতেকিনের হ্যান্ডব্যাগে রাখা আছে। [গুলতেকিন, আমার স্ত্রীর নাম। এই ভয়াবহ নাম তার দাদা রেখে গেছেন। বিয়ের পর বদলাতে চেয়েছিলাম, পারি নি।]

লন্ডনে ছ' ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। আমি মহানন্দে সিগারেট টানছি। গুলতেকিন বলল, মুখের সামনে সিগারেট টানবে না তো। বমি আসছে। অন্য কোথাও গিয়ে সিগারেট শেষ করে আসো। আমি বিমর্ষ মুখে উঠে গেলাম। এদিক-ওদিক ঘুরছি। এই উদ্দেশ্যহীন ঘোরাই আমার কাল হলো। একসময় দেখি—আমি এয়ারপোর্টের বাইরে। ভেতরে ঢুকতে গেলাম আর তো ঢুকতে পারি না, যতই বলি—আমি একজন ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

ভুল করে বাইরে চলে এসেছি, ততই তাদের মুখ অন্ধকার হয়। আমাকে নিয়ে গেল পুলিশের কাছে, মৈনাক পর্বতের মতো সাইজ। কথা বলছে না তো মেঘ গর্জন করছে।

তুমি বলছ, তুমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার ?

আমি বিনয়ে গলে গেলাম। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিনয়। আমি মধুর গলায় বললাম, ইয়েস স্যার।

দেখি তোমার পাসপোর্ট!

পাসপোর্ট আমার সঙ্গে নেই।

বিনা পাসপোর্টে তুমি সিকিউরিটি এলাকা অতিক্রম করে বের হলে কী করে ?

আমি জানি না স্যার। হাঁটতে হাঁটতে কী করে যেন চলে এসেছি।

তোমার দেশ কোথায় ?

বাংলাদেশ।

ও, আই সি।

এমনভাবে 'ও, আই সি' বলল যাতে মনে হতে পারে পৃথিবীর সব ভয়াবহ ক্রিমিনালের জন্মভূমি হচ্ছে বাংলাদেশ। আমি গলায় মধুর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি যদি আমাকে ট্রানজিট এরিয়াতে নিয়ে যান তাহলেই আপনার সব সন্দেহের অবসান হবে। আমার স্ত্রী দুই মেয়ে নিয়ে সেখানে আছে। তার হ্যান্ডব্যাগে আমার পাসপোর্ট।

এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আমি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রওনা হলাম। মনে হলো বিপদ কেটেছে। কিন্তু না, বিপদ কাটবে কোথায়, বিপদের সবে শুরু। সে আমাকে ছোট একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। হতভম্ব হয়ে লক্ষ করলাম, এটা একটা হাজত। ব্যাটা ফাজিল, আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমার বিদেশভীতির উৎস ধরে ফেলেছেন। আমার এই বিদেশাতঙ্কের কারণেই ইউএসআইএস-এর জনৈক কর্মকর্তা যখন টেলিফোন করে বললেন, আপনি কি কিছুদিনের জন্য আমেরিকা বেড়াতে যেতে আগ্রহী ?

আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বললাম, জি-না।

কেন বলুন তো ?

আমি ওই দেশে ছ'বছর থেকে এসেছি।

সে তো অনেক দিন আগের কথা। এখন যান, আপনার ভালো লাগবে। পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে লেখকেরা আসছেন। আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আপনি যান।

কত দিনের ব্যাপার ?

অল্পদিন—এক মাস।

এক মাস হলে ভেবে দেখি।

ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা ব্যবস্থা করছি—আপনার নাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

তাঁরা যথাসময়ে যোগাযোগ করলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন—প্রোগ্রামে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এক মাস নয়, থাকতে হবে প্রায় তিন মাস।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিন মাস কী করে থাকব?

আমার বিদেশযাত্রার সংবাদে কয়েকজনকে খুব উল্লসিত মনে হলো। তাদের অন্যতম আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিপাশা। সে ঘোষণা করল, আমিও বাবার সঙ্গে যাব। আমার জন্য টিকিট কাটার দরকার নেই। আমি বাবার কোলে বসেই যেতে পারব।

সে তার ছোট স্যুটকেস অতি দ্রুত গুছিয়ে ফেলল; টুথব্রাশ, সাবান, তোয়ালে। তার কাণ্ড দেখে অন্যরা হাসছে, কিন্তু কষ্টে আমার কান্না পাচ্ছে—কী করে এদের ছেড়ে থাকব? কী করে কাটবে প্রবাসের দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী?

আমার প্রকাশকদের একজন 'কাকলী প্রকাশনী'র সেলিম সাহেবকেও আমার বিদেশযাত্রায় খুব আনন্দিত মনে হলো। তিনি দুই ভাঁড় দই নিয়ে উপস্থিত হলেন। কোনোরকম আনন্দের ব্যাপার হলেই তিনি তাঁর দেশের বাড়ির মোষের টকদই নিয়ে উপস্থিত হন। অতি অখাদ্য সেই দই দেখলেই হৃৎকম্প হয়, তবু ভদ্রতা করে বলি—অসাধারণ।

সেলিম সাহেব দইয়ের ভাঁড় রাখতে রাখতে হাসিমুখে বললেন, স্যার, শুনলাম আপনি আমেরিকা যাচ্ছেন। শুনে বড় ভালো লাগছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভালো লাগছে কেন বলুন তো!

সেলিম সাহেব লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, ফিরে এসে 'হোটেল গ্রেভার ইন'-এর মতো একটা বই লিখে ফেলবেন। আমি ছাপব।

আমি তাঁর আনন্দের কারণ এতক্ষণে বুঝলাম। আমেরিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে *হোটেল গ্রেভার ইন* নামে কিছু স্কেচধর্মী লেখা লিখেছিলাম। সেই বই পাঠকেরা আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন। এবং সেলিম সাহেব হচ্ছেন বইটির প্রকাশক।

স্যার, আপনি যাওয়ার আগে আগে আরও দই দিয়ে যাব। আমার ছোটভাইকে দেশে পাঠিয়েছি, ও নিয়ে আসবে।

থ্যাংকস।

অনেকেই এই দই পছন্দ করে না। একমাত্র আপনাকেই দেখলাম আগ্রহ করে খান। ভালো জিনিসের মর্যাদা খুব কম মানুষই বোঝে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, খুবই খাঁটি কথা।

বইয়ের নামটা কি দিয়ে যাবেন? নাম দিয়ে গেলে কভার করে রাখতাম।

বইটির নাম 'হোটেল মে ফ্লাওয়ার'।

'হোটেল মে ফ্লাওয়ার'?

হ্যাঁ, যে ডরমেটরিতে থাকব তার নাম মে ফ্লাওয়ার...

আর বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। তাহলে কভার করে ফেলি?

করে ফেলুন। আরেকটা কথা সেলিম সাহেব, ওই দইটা না আনলে হয় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark

২

বাঙালির বিদেশযাত্রার প্রথম প্রস্তুতি হচ্ছে স্যুটকেস ধার করা। নিজেদের যত ভালো স্যুটকেসই থাকুক বিদেশযাত্রার আগে অন্যের কাছে স্যুটকেস ধার করতে হবে। এটাই নিয়ম।

গুলতেকিন অবশ্যি নিয়মের ব্যতিক্রম করল—স্যুটকেস কিনে আনল। হুলস্থুল ধরনের বিশাল এক বস্তু। আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, এটা কী!

সে বিরক্ত হয়ে বলল, সবসময় রসিকতা ভালো লাগে না। একটু বড় সাইজ কিনেছি, তাতে হয়েছে কী! স্যুটকেস হলো ঘড়ির মতো, যত ছোট তত দাম বেশি। বেশি দাম দিয়ে ছোট জিনিস কেন কিনব?

কিছু মনে কোরো না গুলতেকিন, এই বস্তু এরোপ্লেনের দরজা দিয়ে ঢুকবে না। দরজা কেটে ঢুকাতে হবে।

দরজা কেটে ঢুকাতে হলে দরজা কেটে ঢুকাবে। আর এই নাও তোমার হ্যান্ডব্যাগ।

হ্যান্ডব্যাগ দেখেও আমি চমৎকৃত হলাম। সেই হ্যান্ডব্যাগে নানান জায়গায় গোটা ত্রিশেক পকেট। আমি বিস্ময়মাখা গলায় বললাম, অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস তোমার চোখে পড়ে। এইটা তাহলে হ্যান্ডব্যাগ? ধরব কোথায়? হাতল বা কাঁধে ঝুলাবার ফিতা কোনোটাই তো দেখছি না।

দেখা গেল ওই হ্যান্ডব্যাগে হাতে নেওয়ার বা কাঁধে ঝুলাবার ব্যবস্থা নেই। বগলে নিয়ে ঘুরতে হবে। তা-ই সই।

যথাসময়ে হ্যান্ডব্যাগ বগলে নিয়ে এবং পর্বতপ্রমাণ স্যুটকেস টানতে টানতে এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। যিনি বোর্ডিং কার্ড দেন তিনি বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে বললেন, এই স্যুটকেট আপনার? কোত্থেকে কিনেছেন বলুন তো?

বিমান আকাশে উড়ল এবং একসময় বিমানবালার গলায় শুনতে পেলাম—তীস্ হাহার ফুট উছতায়—অর্থাৎ আমরা ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতায় ভ্রমণ করছি।

বাংলাদেশ বিমান এই অদ্ভুত উচ্চারণের বাংলা কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে! বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক মরহুম আবু হেনা মোস্তফা কামালের এই বিষয়ে একটি থিওরি আছে। তিনি মনে করেন, এই উচ্চারণ ওরা পেয়েছে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে। একসময় পিআইএ-র কোনো বাঙালি বিমানবালা ছিল না। উর্দুভাষী বিমানবালারা অনেক কষ্টে এইভাবে বাংলা বলত। সেই থেকে এটাই হয়ে গেল বিমানের স্ট্যান্ডার্ড বাংলা উচ্চারণ। পাকিস্তানি ভূত এত সহজে ঘাড় থেকে নামবার নয়। এখনকার বাঙালি বিমানবালারা অনেক কষ্টে উর্দু উচ্চারণে বাংলা রপ্ত করে। এই উচ্চারণ এদের অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষায় শিখতে হয়। ওদের ট্রেনিংয়ের এটাই সবচেয়ে শক্ত পার্ট।

হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছালাম ভোরবেলা। বিমান থেকে নেমে ট্রানজিট লাউঞ্জে যাওয়ার আগেই বিপদে পড়ে গেলাম। বিপদে পড়ব জানা কথা, এত আগে পড়ব বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~Watermark